বাঙ্গালীর খাদ্য

তৃতীয় সংস্করণ

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন এল, এ, এম, এস প্রণীত

প্রকাশক—গ্রন্থকার
"আরোগ্য নিকেতন"
২০নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ৷৹ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল
নিউ আর্য্যমিশন প্রেস
৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

—•—

নিষ্ঠাবান্ সাহিত্য-সেবক

ও

সাহিত্য-বন্ধু

শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

করকমলেষু—

গুণমুগ্ধ

ইন্দু

প্রথম বারের নিবেদন

"বাঙ্গালীর খাদ্যের" প্রথমাংশ "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" নামক মাসিক পত্রে "খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ" নামে ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল। তখন অনেকেই উহা পুস্তকাকারে বাহির করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহা পুস্তকাকারে বাহির করিবার পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুত চুণীলাল বসু মহোদয়কে পুস্তকখানি দেখিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিই। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের অধিকাংশ পড়িয়া আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া আমাকে লিখিয়াছেন,—"আপনার পুস্তক পাঠে লোক উপকৃত হইবে।" তাঁহার এই শ্রম-স্বীকার ও উৎসাহ দানের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। এইস্থানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি যে, এই পুস্তকের খাদ্য বিশ্লেষণের যে "চার্ট্"-সমূহ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার প্রসিদ্ধ 'খাদ্য' পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

মদীয় আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন সরস্বতী মহোদয় একটি 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়া এই পুস্তকের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আমার ভক্তি-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

১লা জানুয়ারী, ১৯২৮
আরোগ্য-নিকেতন
২০নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

দ্বিতীয় বারের নিবেদন

এত শীঘ্র যে, "বাঙ্গালীর খাদ্যের" প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাইবে, ইহা আমি আশা করি নাই। খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে জানিবার জন্য, বাঙ্গালীর যে আগ্রহ বাড়িয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কতিপয় ডিষ্ট্রিক বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড প্রচার-কার্য্যের জন্য এই পুস্তক ক্রয় করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কয়েকটি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদের পাত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। অথচ দাম পূর্ব্ববৎই রাখিলাম। ইতি—

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ — গ্রন্থকার

সূচী

ভূমিকা

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন-সরস্বতী এম্ এ ; এল্ এম্ এস্ মহোদয় লিখিত]

বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা যে কি গুরুতর ব্যাপার, তাহা যাঁহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারাই জানেন। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবেই আজ বাঙ্গালীর এ ভীষণ দুর্দ্দশা। এত রোগ-শোকের মূলেও এই খাদ্যাভাব, পক্ষান্তরে যাঁহারা ভাল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাইতে পান, তাঁহারা অনভিজ্ঞতা বশতঃ উপযুক্ত খাদ্য খান না। তাই আজ ছোট বড় সকল বাঙ্গালীই রুগ্ন।

কবিরাজ শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে খাদ্য-সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী মতও দেখাইয়াছেন। এইরূপ তুলানাত্মক জ্ঞান-বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রোগে পথ্যাপথ্য নির্ণয় সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব সুপ্রসিদ্ধ। অন্যদিকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ আছে, অন্যত্র সেরূপ দেখা যায় না। হয়তো বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ লোকের নিকট এ সকল কথা নূতন বোধ হইবে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এ সকল মানিয়া চলিতেন বলিয়াই সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইতেন।

শরীরের সুদৃঢ় গঠন ও রক্ষণের জন্য জান্তব আহার একান্ত আবশ্যক। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব—এ সকলই জান্তব খাদ্য, তন্মধ্যে দুগ্ধ নিরামিষ বলিয়া ধরা হয়। যাঁহারা বিধবা বা সন্ন্যাসী তাঁহারও দুগ্ধ পান করেন। একটা কথা আছে 'দুধে মাছে বাঙ্গালীর শরীর'—সেই দুধের ও মাছের অভাবে

ধনী দরিদ্র সকলেই এখন রোগের জ্বালায় বিব্রত। সেই দুধ-মাছ পুনরায় সুলভ না হইলে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। আর প্রচুর দুধ-মাছের প্রয়োজনীয়তাও বা বুঝেন কয়জন ?

এই সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্বর্গীয় ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক, রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু প্রভৃতি যাঁহারা অগ্রণী হইয়া দেশের লোককে খাদ্যতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র, আর আজ আয়ুর্ব্বেদের দিক দিয়া কিছু কিছু খাদ্যতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টার জন্যও শ্রীমান ইন্দুভূষণের উদ্যম প্রশংসনীয়,—সন্দেহ নাই। কিন্তু বলিবার আছে অনেক,—বলা হইয়াছে অল্প। আশা করি, ভবিষ্যতে সবটা বলিতে তিনি বা আর কেহ চেষ্টা করিবেন।

বাঙ্গালীর খাদ্য

প্রথম অধ্যায়

খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য দ্রব্যই আমাদের শরীররক্ষার মূল। শারীরিক পুষ্টিসাধন এবং শারীরিক কার্য্যক্ষমতা লাভ—খাদ্য ভিন্ন হইতে পারে না। আমরা খাদ্যরূপে যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহাই আমাদের শরীরটিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। শরীরের মধ্যে যে সকল যন্ত্র আছে, তাহারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহাদিগের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য যে প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহাই ক্ষুধা, তৃষ্ণারূপে আমাদের দেহে প্রকাশ পায়। খাদ্যের প্রয়োজন এই জন্যই; ফল কথা, যথোপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্যসকল খাদ্যরূপে গ্রহণ না করিলে, মানবের দেহযন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে, শারীরিক শক্তিহীনতা এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ তাহারই ফলস্ভূত।

পাশ্চাত্য-স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদের কথা।

পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে সকল দ্রব্য অক্সিজেন কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে এবং শারীরিক সামর্থ্য আনিয়া দেয়—

তাহার নাম খাদ্য। তাঁহাদের মতে, খাদ্য গ্রহণ করার পরে উহার অর্গানিক পদার্থ নিশ্বাস বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা যে সময় দগ্ধ হইয়া যায়, সেই সময় শরীরে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ তাপই শারীরিক ক্রিয়া সকল সাধন করিবার উপায়স্বরূপ। জাহাজ এবং রেলগাড়ী প্রভৃতি তাপ সাহায্যে যেরূপ চলচ্ছক্তি পাইয়া থাকে, খাদ্য গ্রহণের পর উহা হইতে মানবদেহে উৎপন্ন তাপও সেইরূপ গতিসংসাধক।

শারীরিক ক্ষয়ের কারণ। আমরা প্রত্যেক কার্য্যেই শারীরিক ক্ষয় করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্কের কতকগুলি স্নায়ুজীবকোষ ধ্বংস বা নিস্তেজ হইতে পারে। পদবিক্ষেপের ফলে, মাংসপেশীর গ্রন্থি সকলের কতকগুলি জীবকোষ ধ্বংস হইয়া থাকে। চর্ব্বণের ফলে খানিকটা লালা যাহা নিঃসৃত হইল—তাহার দ্বারা কতকগুলি জীবকোষের ধ্বংস হইয়া থাকে। এইরূপে সর্ব্বদাই আমাদের শারীরিক অপচয় ঘটিতেছে। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। নানাকারণে সর্ব্বদাই আমাদের দেহ হইতে কতকগুলি জীবকোষ যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, সেইরূপ উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে নূতন জীবকোষ পুরাতনের স্থান গুলিও পূর্ণ করিতেছে—কাজেই আমরা শরীরের কোন অংশের যে ক্ষতি হইতেছে—তাহা মনে করিতে পারি না। এক কথায় শারীরিক ক্ষতি পূরণ—খাদ্যভিন্ন কোনক্রমেই সম্ভব নহে।

কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু যা' তা' কতকগুলি দ্রব্য ভক্ষণ করিলেই শারীরিক ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা নাই। প্রাণীমাত্রেরই দেহ নানাপ্রকার ধাতব, উপধাতব ও জৈবিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা যাহা আহার করি, তাহা মুখ-মধ্যস্থ লালারসের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে পাকস্থলী, যকৃত এবং অন্ত্রের বিবিধ রস দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিভ্রমণ করে এবং কিয়দংশ রক্তের সহিত মিলিত

হয়। শরীরমধ্যস্থ জীবকোষগুলি (animal cells) ঐ রক্ত হইতে নিজ নিজ প্রয়োজনানুরূপ পদার্থ গ্রহণ করিয়া লয় এবং যে সকল জীবাণু মরিয়া গিয়াছে বা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, সে গুলিকে বাহির করিয়া দেয়। কাজেই মৃত বা অকার্য্যকর জীবকোষের স্থলে নূতন জীবকোষের পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা একান্তই কর্ত্তব্য। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ না করিয়া, যদি যা' তা খাইয়া উদরপূর্ত্তি করা যায়, তাহা হইলে, তাহার ফলে কখনই ক্ষয়ের পরিপোষণ হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে, একমাত্র তাপ-উৎপাদন ও ক্ষয়নিবারণ করা ব্যতিরেকে খাদ্যের উদ্দেশ্য—বল-উৎপাদন এবং দেহের বৃদ্ধিসাধন। এই জন্যই খাদ্য-বিচার আবশ্যক।

খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা। সাধারণে মনে করেন, অধিক খাইলেই বুঝি শরীরের পুষ্টিসাধন হইল। কেহ বা মনে করেন, মাছ মাংস অধিক খাইলে শারীরিক পুষ্টিলাভ অবশ্যম্ভাবী। কাহারও কাহারও ধারণা, শাকসব্জী খাইলে শারীরিক উন্নতিলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই—ঐগুলি একেবারেই অসার, শরীরপুষ্টির কোন উপাদানই উহাতে নাই। এসকল কিন্তু অতিশয় ভ্রান্ত ধারণা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের শরীরমধ্যস্থ কর্ম্মনিরত যন্ত্রসকল যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনই খাদ্যের প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে, যদি যন্ত্রসকল অবসন্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যদি সে সময় খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শারীরিক পুষ্টিলাভের পরিবর্ত্তে, শারীরিক ক্ষতিই হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মাংসই হউক, মাছই হউক, দুগ্ধই হউক, ঘৃতই হউক—যে জাতীয় শারীরিক ক্ষতি হইতেছে, সেই জাতীয় দ্রব্যের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। তা' ছাড়া, যে শাকসব্জীর কথা বলা হইল, সেগুলিও আমাদের শারীরিক পুষ্টিবিধানের বিশেষ সহায়ক না হইলেও, কতকটা যে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চিত। আসল কথা, কতকগুলি

গুরুপাক দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিলেই শরীরের উন্নতি হয় না; স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে, দেহধারণের উপযোগী খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবদেহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মানবদেহের পদার্থ সমূহ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমাদের দৈহিক যন্ত্রসকল অনবরত নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই পরিপুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন। এ অবস্থায় আমাদের দেহের ভিতরকার সংবাদ জানাও একটু আবশ্যক। দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, আমাদের দেহে প্রতি শত অংশে অম্লজান (Oxygen) ৭২, অঙ্গার (Carbon) ১০৷৷০, উদ্‌জান (Hydrogen) ৯, যবক্ষারজান (Nitrogen) ৪৷৷০, ক্যালসিয়ম ১'৩ এবং ফস্ফরাস্ ১'১ ভাগ আছে। ইহা ভিন্ন গন্ধক, লৌহ, সোডিয়ম্, পটাসিয়ম্, ক্লোরিণ্, ম্যাগনেসিয়ম্ ও সিলিকণও কিছু কিছু আছে।

মূলপদার্থ। কিন্তু এতগুলি পদার্থ শরীরের মধ্যে পৃথক্ ভাবে থাকে না, কেবলমাত্র সামান্য পরিমাণে অম্লজান, উদ্‌জান্ ও যবক্ষারজান—রক্ত ও অন্ত্রের মধ্যে নিহিত থাকে। বাকী পদার্থগুলি পরস্পরের মিশ্রণ সাহায্যে Proximate বা আদিমিশ্র নামক পদার্থ উৎপন্ন করে, ইহাদের দ্বারাই শরীর নির্ম্মিত হয়। এই "আদি মিশ্র" পদার্থগুলিকে

আবার তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়,—১ম যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ সমূহ (Nitrogenous Proximate), ২য় যবক্ষারজানশূন্য জৈবিক অন্তিম পদার্থ সমূহ (Non-nitrogen), এবং ধাতব ও উপধাতব পদার্থ সমূহ (Mineral)

(১) যবক্ষারজান পদার্থ। এই যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে অঙ্গার, অম্লজান, উদ্‌জান এবং যবক্ষারজান নামক কয়েকটি পদার্থ আছে। গন্ধক ও ফস্‌ফরাসও বিদ্যমান থাকে। এই যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে (ক) এলবুমেন (Albumen) (খ) মাইওসিন (Myosin) (গ) ফাইব্রিণ (Fibrin) (ঘ) গ্লোবুলিন (Globulin) (ঙ) কেজিন (Caseine) (চ) মিউসিন (Meucine) (ছ) জেলাটিন (Gelatine) (জ) ফারমেণ্ট (Ferments) (ঝ) বর্ণপ্রদায়ক ও সেরিব্রিণ (Cerebrine) নামক কয়েকটি প্রধান। উহারা আমাদের দেহে বহুভাবে বিস্তৃত। এই পদার্থ গুলির মধ্যে এলবুমেন—মনুষ্য দেহের রক্ত ও অন্যান্য দৈহিক রসে নিহিত এবং ডিম্বের শ্বেত অংশের মত বর্ণবিশিষ্ট। মাইওসিন—মানব দেহের মাংসপেশীর রস। ফাইব্রিণ—রক্তের ঘনকারক পদার্থ। গ্লোবুলিন—মানব দেহের রক্ত ও অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। কেজিন—দুগ্ধের ছানার মত পদার্থ। মিউসিন—শ্লৈষ্মিক পদার্থ। জেলাটিন—অস্থি ও গ্রন্থি সকলকে উত্তাপ দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া উৎপন্ন হয়। ফারমেণ্ট—পাচকরস সকলের সারাংশ। বর্ণ প্রদায়ক—রক্ত, পিত্ত, মূত্র ও ঘর্ম্ম সকলের বর্ণকারক। সেরিব্রিণ—স্নায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান।

(২) যবক্ষারজান শূন্য আদিমিশ্র পদার্থ সমূহ। ইহাদের উপাদান তিনটি,—অঙ্গার, অম্লজান এবং উদ্‌জান। এই তিনটির মিশ্রণেই ইহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরের প্রায় সকল স্থানেই

তৈলময় পদার্থ বর্ত্তমান। যবক্ষারজানশূন্য আদিমিশ্র পদার্থ সমূহে অঙ্গারের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী এবং অম্লজানের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু ইহা শরীরের মধ্যে থাকিয়া অম্লজানের সহিত মিলিত হইলে শরীরে উত্তাপ উৎপন্ন করে এবং তাহার ফলে শৈত্য দূর হয়। গ্লাইকোজেন অর্থাৎ এক প্রকার শ্বেতসার পদার্থও এই উপাদান গুলিতে আছে; শরীরের যে স্থানে খুব দ্রুত কার্য্য চলিতেছে, সেই স্থলে উহা পাওয়া যায়। উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন এবং স্তনদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দুই প্রকার শর্করা এবং অম্লরস সমূহও এই পদার্থ গুলিতে পাওয়া যায়।

(৩) ধাতব ও উপধাতব পদার্থ। মানবদেহে ধাতব এবং উপধাতব পদার্থের সংখ্যাই অধিক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে —জল শরীরের সকল স্থলেই পাওয়া যায়, এমন কি, অতিশয় কঠিন যন্ত্র—অস্থি এবং দন্তও জলশূন্য নহে। ইহা ভিন্ন সোডিয়ম্ ও পটাসিয়ম্ ক্লোরাইড্ শরীরের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। মানব দেহের অস্থির প্রধান উপাদান, ক্যালসিয়ম ফস্ফেট্। লৌহও অম্লজানের সহিত পাওয়া যায়।

মূল ভৌতিক পদার্থগুলির ক্ষয় ও পরিপূরণ। এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে, আমাদের শরীর কতকগুলি ভৌতিক পদার্থ দ্বারা গঠিত, তাহার ক্ষয়ের পরিপূরণের জন্য ঐ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। সেই জন্যই পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কতকগুলি যা' তা' খাদ্য গ্রহণ করিলেই শারীরিক উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা দেহতত্ত্ব সংক্ষেপভাবে বুঝাইতে গিয়া যে আদিমিশ্র পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়াছি, ঐ আদিমিশ্র পদার্থগুলির যখন যেটির ক্ষয় হইতেছে, তজ্জাতীয় খাদ্য গ্রহণের ফলে তাহার পরিপোষণ হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, সুস্থদেহ ব্যক্তি প্রত্যহ ৩০৭ গ্রেণ নাইট্রোজেন এবং ৪৭০০ গ্রেণ কার্ব্বণ শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলে। অতএব, এই

নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণ প্রত্যহ এত অধিক পরিমাণ বাহির হইয়া যাওয়াতে, উহার পুনঃপুষ্টির জন্য ঐ জাতীয় খাদ্যই আমাদিগের প্রত্যহই খাওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মনে না রাখিয়া, যাঁহারা অন্যরূপ খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য কখনই সমুন্নত হইতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

শরীর ধারণের জন্য কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন ?

শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য। মানবদেহ যেরূপ পদার্থ দ্বারা গঠিত, তাহা বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত পদার্থ সমন্বিত খাদ্য-গুলি প্রত্যহ ভোজন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন,—

১ম। প্রোটিন্ বা আমিষ জাতীয়

২য়। ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয়

৩য়। কার্ব্বোহাইড্রেটস্ বা শালিজাতীয় (শ্বেতসার ও শর্করা)

৪র্থ। লবণজাতীয়

৫ম। জল

আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করিলে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় না এবং দহনক্রিয়ারও ব্যত্যয় ঘটে। ইহার অভাবে শারীরিক তাপ উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে মানবদেহের ভৌতিক পদার্থগুলি বুঝাইবার সময় আমরা যে যবক্ষারজানময় ভৌতিক পদার্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছি—আমিষ-জাতীয় খাদ্য তাহারই অন্তর্গত। যবক্ষারজানময় খাদ্য—এলবুমেনস্

পদার্থপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণ বলেন,—এরূপ খাদ্য গ্রহণের ফলে (১) দেহের শক্তি বা তেজ প্রকাশিত হয় (২) শারীরিক রস সমূহও এই যবক্ষারজানময় খাদ্য গ্রহণের ফল (৩) যান্ত্রিকক্রিয়া পরিচালনার ইহা প্রধান সহায় (৪) যদি যবক্ষারজানময় খাদ্য পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে যান্ত্রিক ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায়। যবক্ষারজানময় খাদ্যের দ্বারা—শরীরের মেদ, মাংস ও স্নায়ু প্রভৃতির যে সকল ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহার পূরণ ও পুনর্নির্ম্মাণ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, শ্বেতসার বা তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণ শরীর ধারণের পক্ষে উপযোগী হইলেও, যবক্ষারজানের সহায়তা পাইয়াই ঐ সকল খাদ্য হইতে তেজ উৎপন্ন হয়। এবং ঐ তেজ দ্বারাই পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য হইয়া থাকে এবং উহাই উত্তাপরূপে পরিণত হয়। যবক্ষারজানময় খাদ্যের অন্তর্গত প্রোটিন্ খাদ্য গ্রহণ না করিলে, দেহ-তন্তু (Tissue) এবং রস সমূহের গঠন ও ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। বায়ু হইতে অক্সিজেন অংশ গ্রহণেরও অভাব হয়। এই প্রোটিড্ খাদ্যের দ্বারা কোন কোন স্থলে চর্ব্বির গঠন এবং শক্তির (Energy) বিকাশ হইয়া থাকে। মৎস্য, মাংস, ছানা, ডাল প্রভৃতি খাদ্য হইতে এই আমিষ উপাদান পাওয়া যায়।

ফ্যাট্ বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। এই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা—চর্ব্বি প্রস্তুত হয় এবং ইহা হইতে তেজ ও শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধনও ইহা হইতেই হইয়া থাকে। এই জাতীয় খাদ্যের অভাব হইলে শিশুদিগের রিকেটস্ নামক পীড়া হইতে পারে। মৎস্য ও মাংসের চর্ব্বি, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য।

কার্ব্বহাইড্রেটাস্ বা শালিজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। এই খাদ্যগ্রহণের ফলেও চর্ব্বি প্রস্তুত হয় এবং শারীরিক উত্তাপ ও তেজ

জন্মিয়া থাকে। আমরা যে চাউল, গম, আলু, চিনি, এরারুট প্রভৃতি খাইয়া থাকি, তাহারা এই জাতীয় খাদ্য।

লবণ জাতীয় খাদ্যের আবশ্যকতা। এই জাতীয় খাদ্যের অভাবে 'স্কার্ভি' নামক রোগ উপস্থিত হইতে পারে। মুখনিঃসৃত লালা ও পাকস্থলীনিঃসৃত রসের পরিপাক করিবার ক্রিয়া, এই জাতীয় খাদ্যের উপরে নির্ভর করিতেছে। অস্থিগঠন ও পরিপাককার্য্যের সুবিধার জন্য হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ উৎপাদন, শরীরের পুষ্টিসাধন এবং শক্তির পরিচালন —এই খাদ্যগ্রহণ না করিলে হইতে পারে না। আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি, তাহা ভিন্ন— শাকসব্জি ও ফল মূলের মধ্যস্থ ফস্‌ফেট্ অব লাইম পটাস্, সোডা ও মাংসস্থিত গন্ধক প্রভৃতি এই জাতীয়।

জলের আবশ্যকতা। জলের অভাবে পরিপাক ক্রিয়া এবং পোষণ কার্য্য সম্যক্‌রূপে সাধিত হইতে পারে না, মাংসপেশী সকল এবং স্নায়ুমণ্ডলী তেজোহীন হইয়া পড়ে, শরীর শুকাইয়া যায় এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে। জল গ্রহণের ফলে রক্ত তরল থাকে। জল গ্রহণ না করিলে রক্ত গাঢ় হওয়ায়, শরীর মধ্যস্থ দূষিত পদার্থ সকল বাহির হইতে পারে না, কাজেই নানারূপ রোগগ্রস্ত হইতে হয়। জল গ্রহণের ফলে, ঘর্ম্ম ও মূত্রাদিরূপে শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত ও দূষিত অংশ সমস্ত বাহির হইয়া যায়। আমরা যে জল পান করিয়া থাকি, তাহা ভিন্ন সকল খাদ্যেই অল্পবিস্তর পরিমাণে জল মিশ্রিত থাকে।

ভাইটামিন বা খাদ্য প্রাণ। উপরে খাদ্যের যে সকল উপাদানের কথা কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন শরীর রক্ষার জন্য আরও কয়েক জাতীয় উপাদান নিতান্ত প্রয়োজন। সে উপাদানগুলি জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও রোগনিবারক। সেগুলিকে 'ভাইটামিন' বা খাদ্যপ্রাণ" বলে। মৎস্য, পক্ষীর ডিম্ব, এবং দুগ্ধ, অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতিতে এই ভাইটামিন্ যথেষ্ট আছে। বিজ্ঞানবিদ্‌পণ্ডিতগণ বলেন ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে

বেরিবেরি, স্কার্ভি এবং রিকেট্‌স্ নামক পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। রন্ধনের সময় আমাদের অনেক খাদ্য হইতেই ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। চাউল ছাঁটিয়া লওয়ার জন্যও উহা হইতে এই ভাইটামিন্ নষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে মাজা পরিষ্কার ধব্‌ধবে চাউল অপেক্ষা, মোটা এবং আমাজা চাউলে ভাইটামিন্ অধিক থাকায়, উহা শরীরপুষ্টির বেশী সাহায্যকারী। ভাইটামিন্ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য

চাউল। আমরা যে সকল খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করি, তাহার মধ্যে চাউলই সর্ব্বপ্রধান। শুধু বাঙ্গালা দেশের কথা নহে, পৃথিবীর প্রায় তাবৎপ্রদেশের অধিবাসিগণই অল্পাধিক পরিমাণে চাউল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ত' ইহা জীবনস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই চাউল বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে জন্মিয়া নানাপ্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পাটনাই, বালাম, দেশী, বাঁকতুলসী, বোম্বাই, দাদখানি, চিনিশক্কর, ব্রহ্মদেশীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বালাম অপেক্ষা দেশী চাউলের অন্ন খাইতে সুস্বাদু বলিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই দেশী চাউলের অধিক পক্ষপাতী ; বোম্বাই প্রদেশের এবং পূর্ব্ববঙ্গের উৎপন্ন চাউল অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন চাউল অপেক্ষা অধিক সারবান্।

নূতন ও পুরাতন চাউল। নূতন চাউল অপেক্ষা পুরাতন চাউল সহজপাচ্য এবং অধিক পুষ্টিকর। অন্ততঃ ছয়মাসের পুরাতন না হইলে, সেই চাউল ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। নূতন চাউল গুরুপাক, এজন্য নূতন চাউল উঠিলে, উহা খাইয়া আমাদের দেশের বহুসংখ্যক লোক এই সময় উদরাময়ে ভুগিয়া থাকে।

ভাতের ফেন। সাধারণতঃ আমরা ভাতের ফেন গালিয়া অন্ন খাইয়া থাকি। উহাতে অন্নের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। কারণ একসের চাউল সিদ্ধ করিলে প্রায় তিন সের মাড় জন্মে। এই তিন সের মাড়ে দুই ছটাকের অধিক শ্বেতসার বাহির হইয়া যায়। এই শ্বেতসারের মধ্যে যবক্ষারজানেরও অংশ আছে, ফেন গালিলে তাহারও পরিমাণের হ্রাস হয়। কোন্ সময় হইতে কাহার কর্তৃক যে ভাতের ফেন গালিবার এই অনিষ্টকর প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার তথ্য নির্ণয় করা দুরূহ। আমাদের দেশের গরীব লোকেদের মধ্যে শুধু ফেন খাইবার প্রথাও প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ। ভাতের ফেন গালিয়া খাওয়ায় আমরা যেরূপ অন্নগ্রহণের সম্যক্ ফলে বঞ্চিত আছি, সেইরূপ উহার ফলে আমরা অর্থেরও অপচয় করিতেছি বলিতে পারা যায়। ছোট ছেলেদের পোরের ভাত দিবার প্রথা এখনো আমাদের দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই, এই পোরের ভাত প্রস্তুত করিতে হইলে ফেন গালিতে হয় না, এবং পোরের ভাত যাহাদিগকে খাওয়ান হয়, তাহারা উহার ফলে যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া থাকে। এখন পোরের ভাতের মত অন্ন প্রস্তুত করিবার জন্য নানাবিধ কুকারের যে প্রচলন হইয়াছে, উহাতে ফেন গালিতে হয় না। ফল কথা, সাধারণ ভাবে এখন আমরা যে ভাবে ফেন গালিয়া ভাত খাইয়া থাকি তাহার ফলে আমরা ভাতের ফল যতটা পাওয়া উচিত, তাহা প্রাপ্ত হইনা।

সিদ্ধ ও আতপ চাউল। সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল অধিক পুষ্টিকর। সিদ্ধ চাউল প্রস্তুতের সময় বেশী করিয়া ছাঁটিলে উহাতে লবণজাতীয় পদার্থ ও ভাইটামিন অত্যন্ত কম থাকিয়া যায়। কাজেই উহা বেশী পুষ্টিকর তো হয়ই না, তদ্ভিন্ন বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, এরূপ চাউলে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণের ফলে বেরিবেরি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। আমাদের দেশে সিদ্ধ চাউলের অধিক প্রচলন, কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে সিদ্ধ চাউলের আদৌ প্রচলন নাই। সেই জন্য বাঙ্গালী অপেক্ষা সকল স্থানের অধিবাসিগণই অধিক শক্তিশালী। বাঙ্গলার বিধবাদিগের অধিকাংশই সিদ্ধ চাউল না খাইয়া আতপান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহারা সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা অনেকটা সুস্থদেহ ও নীরোগ থাকেন। ফল কথা, ভাতের ফেন গালিয়া যেমন খাওয়া উচিত নহে, সেইরূপ অন্যান্য দেশের মত সিদ্ধ চাউলের পরিবর্ত্তে আতপ চাউলের অন্ন গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বহু আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি যে কেন এই অনিষ্টকর প্রথা আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যায় না, বলিতে পারি না।

চাউল হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার খাদ্য। চাউল হইতে শুধু ভাত নহে মুড়ি, চিড়া, প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এগুলি ভাতের অপেক্ষা বেশী সারবান, তাহার কারণ ভাতের মত এগুলি হইতে ফেন গালিবার আবশ্যক হয় না, সেইজন্য চাউলের সমস্ত অংশই ইহাতে থাকিয়া যায়। মুড়ি, চিড়া প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের পরিবর্ত্তে বাসি বিস্কুট প্রভৃতি শিশুদিগকে খাইতে দেওয়া একদিকে যেমন অকারণ ব্যয়সাপেক্ষ, অন্যদিকে তেমনি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকারক।

চাউলের মধ্যে ছানাজাতীয়, মাখনজাতীয় ও লবণজাতীয় উপাদান অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে, শর্করাজাতীয় দ্রব্যের অংশই ইহাতে

অধিক। চাউলে শর্করাজাতীয় অংশ অধিক বলিয়াই ইহার সহিত ডাল, তরকারি, মাছ এবং দুগ্ধাদি খাইবার দরকার হয়।

চাউল সম্বন্ধে ডাক্তারি কথা। ডাক্তার বেনেট বলেন, অন্নের গুণ ধারক, উদরাময় প্রভৃতি রোগে রোগীকে পুরাতন চাউলের অন্ন ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক চিকিৎসকেরই মত যে, বার্লী, সাগু অপেক্ষাও ইহা অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ডাক্তারেরা বলেন, ডেক্‌ষ্ট্রীন্ (Dextrine) এবং সেলিউলোজ (Cellulose) নামক অপাচ্য পদার্থ চাউলে ২'১ পরিমাণ থাকে।

চাউলের প্রকার ভেদে উপাদানের বিশ্লেষণ। এখনকার পণ্ডিতগণ চাউলের প্রকারভেদ করিয়া উহাতে যে সকল উপাদান আছে, তাহার যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

দাল। চাউলের পরই দালের কথা বলিতে হয়, কারণ চাউল হইতে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণের প্রধান উপকরণই অনেক স্থলে দাল। এক কথায়, চাউলের নীচেই বাঙ্গালীর খাদ্যের মধ্যে দালের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে যে সকল দাল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মুগ সর্ব্বাপেক্ষা সহজপাচ্য, মসূরও মুগের ন্যায়ই সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গে এবং রাঢ় দেশে কলাইয়ের দালের প্রচলন বেশী, এই কলায়ের দালে শরীরের স্থূলত্ব বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গে মসূর, মুগ, খেঁসারী, মাষকলাই, মটর, অড়হর প্রভৃতিই বেশী প্রচলিত, কিন্তু ইহাদের মধ্যে খেঁসারির দাল ক্রমাগত ব্যবহার করিলে লেথ্‌রিজম (Lathyrism) নামক একপ্রকার বাতব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মত। মসূর দালে ছানাজাতীয় উপাদান অধিক বিদ্যমান। মুগের দাল এবং ছোলার দাল অধিক সারবান। সর্ব্বাপেক্ষা মুগের দাল রোগীর সুপথ্য। পূর্ব্ববঙ্গে মসূর এবং মটরের প্রচলন বেশী।

২৪শ পরগণা, কলিকাতা এবং কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অড়হর ও খেঁসারির প্রচলন বেশী। সকল প্রকার দালই পুষ্টিকর বটে, কিন্তু পুরাতন দাল ব্যবহার করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, কারণ দালে নাইট্রোজেনাস্ পদার্থ যথেষ্ট আছে, কিন্তু টাট্‌কা না হইলে এই অংশের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অল্পতা ঘটিয়া থাকে।

দাল প্রস্তুতের কথা। খুব ভাল করিয়া সিদ্ধ না করিয়া দাল আহার করা উচিত নহে। উহা এরূপ ভাবে সিদ্ধ করিতে হইবে যে, উহার মধ্যে একটিও যেন দানা না থাকে। সুসিদ্ধ দাল খাইলে উহার ৯২ ভাগ সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। স্মরণ রাখা উচিত—মাছ, মাংস অপেক্ষা দাল কম পুষ্টিকর নহে। কিন্তু সুসিদ্ধ না হইলে ইহা জীর্ণ হয় না, কাজেই অনিষ্টের আশঙ্কা বেশী। মাছ, মাংস, দালে ছানাজাতীয় উপাদান অধিক, এই জন্যই নিরামিষভোজী ব্যক্তিগণ যথেষ্ট পরিমাণ দাল খাইলে, মাছ বা মাংসভোজীর অপেক্ষা কখনই সামর্থ্যহীন হইতে পারে না। যাহাই হউক, প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সুসিদ্ধ দাল খাওয়া যে উচিত, তৎ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দালের উপাদানের বিশ্লেষণ—কোন্ কোন্ দালে আমাদের দেহপোষণের উপযোগী কি কি পরিমাণ উপাদান আছে তাহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আয়ুর্ব্বেদে দালের গুণ।—আয়ুর্ব্বেদে দালের সাধারণ গুণ বলা হইয়াছে,—ইহা মধুর-কষায়রসযুক্ত, কটুবিপাক, রুক্ষ, বাতজনক, কফপিত্তনাশক, মল ও মূত্রের অবরোধক এবং শীতবীর্য্য।

মুগ। উপরে যে দাল সম্বন্ধে সাধারণ গুণ-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শ্রেণীবিভাগে বলা হইয়াছে,—মুগ মলসংগ্রাহক,

প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, কফপিত্তহারক, অল্প বায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বরনিবারক। শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নানা প্রকার মুগ আছে, তন্মধ্যে সুশ্রুত বলেন, হরিদ্বর্ণ মুগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মাষকলাই। স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর, বলকারক, মলমূত্রনিঃসারক, মেদোজনক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা অর্শবলি, অর্দ্দিতশ্বাস ও পরিণাম শূল নাশক।

মটর।—মলসংগ্রাহক, লঘু, বাতকর এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ প্রভৃতি নিবারক।

অড়হর।—লঘু, মলসংগ্রাহক, বায়ুজনক, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

ছোলা।—ইহা লঘু কিন্তু বাতজনক। ইহা পিত্ত, রক্তদোষ ও কফ নাশক।

খেঁসারি।—ইহা অতীব রুক্ষ, কফপিত্ত নাশক, রুচিকারক, মলসংগ্রাহক।

দালের প্রকার ভেদে অন্য দ্রব্য।—দাল যেরূপ ভাবে সাধারণতঃ রন্ধন করা হয়, তদ্ভিন্ন ধোকা, বড়া, বড়ী, পাঁপর, কচুরী, ডালপুরী, পিঠা, সরুচাকলি এবং বেশমের প্রস্তুত নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুগের লাড়ু, জিলিপি, বোঁদে, দরবেশ, মিঠাই প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ সকল খাদ্য অতিশয় রুচিকারক, অথচ এ গুলির দ্বারা দাল ভক্ষণের কার্য্যও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

খিচুড়ি।—চাউল ও দাল মিশাইয়া যে খিচুড়ি প্রস্তুত করা হয়—তাহাও অতিশয় পুষ্টিকর। এই খিচুড়ি প্রস্তুত করিলে চাউলের সারভাগ আদৌ নষ্ট হয় না বলিয়া ইহা বলবর্দ্ধনের কার্য্য বেশী করিয়া

থাকে। তবে খিচুড়ি অধিক মসলা এবং ঘৃত দিয়া প্রস্তুত করিলে গুরুপাক হয় বলিয়া, অনেকে বলেন, ইহার প্রচলন বেশী হওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু ইহা ঠিক নহে, খিচুড়ি প্রস্তুত করিবার সময় বেশী মসলা এবং ঘৃত না দিয়া প্রস্তুত করিলে উহা কখনই দুষ্পাচ্য হয় না এবং শরীরপুষ্টির বেশী সাহায্য করিয়া থাকে। ভাতের ফেন ফেলিয়া দেওয়ায় চালের সারভাগ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য আমাদের শরীরপুষ্টির সম্পূর্ণ সাহায্য করে না, কিন্তু খিচুড়িতে সারভাগ নষ্ট হয় না বলিয়া ইহা শরীরপুষ্টির বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে—ইহা সকলেরই মনে রাখিয়া, খিচুড়ির প্রচলন বেশী করা উচিত। আয়ুর্ব্বেদে খিচুড়ির নাম কৃশরা। এই কৃশরা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা।
দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিষ্টম্ভী মলমূত্রকরী স্মৃতা॥

বলকারক, গুরুপাক, পিত্ত-কফ বর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বুদ্ধিপ্রদ ও মলমূত্র প্রবর্ত্তক।

গম বা গোধূম।—বাঙ্গলা দেশে যেমন চাউলের প্রচলন অত্যধিক, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং শুধু উত্তর পশ্চিম প্রদেশ কেন, পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানেই সেইরূপ গোধূমের প্রচলন অধিক। এই গোধূম হইতে আটা এবং ময়দা প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর তাবৎ প্রদেশেই ইহার সমাদর বেশী। সহরের বাঙ্গালীরাও ইহা একবেলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। একবেলা ভাতের পরিবর্ত্তে আটা ব্যবহার করাই সমীচীন।

গোধূমের প্রকার ভেদ।—"দুধে", "গঙ্গাজলি" ও "জামালি" এই তিন প্রকার গোধূমের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার গোধূম হইতে যে ময়দা প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে "দুধে" ও

"গঙ্গাজলি" হইতে প্রস্তুত ময়দার বর্ণ শ্বেত এবং "জামালি" হইতে প্রস্তুত ময়দা কিঞ্চিৎ মলিন।

আটা ও সুজি।—গোধূম হইতে আটা এবং সুজিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ময়দা এবং আটা অপেক্ষা সুজি সহজে জীর্ণ হয়, এই জন্য রোগীদিগের পথ্যে অনেক স্থলে সুজির ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ময়দা বা আটা অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। ইহার কারণ, সুজিতে আমিষ বা ছানাজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। ময়দা ও আটার মধ্যে ভূসি থাকায় উহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, কিন্তু যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় কলের ময়দা অপেক্ষা আমিষ, স্নেহ এবং লবণ জাতীয় উপাদান বেশী, এজন্য ময়দা অপেক্ষা ইহা বলকর। ময়দা অপেক্ষা আটার প্রচলন অধিক হইলে দেশের মঙ্গল।

ময়দায় ভেজাল।—খাদ্য যেমন আমাদের শরীরপুষ্টির সাহায্য করিয়া থাকে, সেইরূপ খাদ্যে যদি ভেজাল থাকে, তাহা হইলে তদ্বারা শারীরিক উন্নতি অপেক্ষা শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। অন্যান্য দ্রব্যের মত ময়দাতেও যথেষ্ট ভেজাল চলিয়া থাকে। চাউলের গুঁড়া ময়দার সর্ব্বপ্রধান ভেজাল। চাউলের দর যদি সস্তা থাকে এবং গমের দর বেশী হয়, তাহা হইলে অনেক দুষ্ট ব্যবসায়ী ময়দার সহিত চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ফট্‌কিরীর গুঁড়া উহার সহিত মিশান হয়। ফট্‌কিরীর গুঁড়া মিশাইলে ময়দা ধব্‌ধবে সাদা হইয়া থাকে, এজন্য অনেক ক্রেতা মনে করেন, এই ময়দা অতি উত্তম, কিন্তু এইরূপ ভেজাল ময়দা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ, অম্ল এবং আমাশয় রোগকে ডাকিয়া আনা হয়। শুনিয়াছি, এক প্রকার পাথরের গুঁড়াও নাকি আজকাল ময়দার সহিত দুষ্ট ব্যবসায়ীরা মিশাইয়া থাকে। আমাদের দেশ যে এত অজীর্ণপ্রবণ, বোধ হয়, তাহার কারণ ইহাই!

যব হইতে ময়দা।—যবাদি শস্য হইতেও ময়দা প্রস্তুত হয় কিন্তু উহা ময়দার ন্যায় মুখরোচক নহে। ফলতঃ গমের ময়দার প্রচলনই অধিক এবং ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চাউল অপেক্ষা ময়দায় নাইট্রোজেন বেশী এবং কার্ব্বণ অল্প। যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় যে ভূসী থাকে, তাহা তুষ্পাচ্য এবং তাহার নীচের অংশ নাইট্রোজেনাস পদার্থে পূর্ণ এবং পুষ্টিজনক। বহুমূত্র বা ডায়াবিটিসের রোগীদিগকে যে যাঁতায় ভাঙ্গা আটার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, ইহাই তাহার কারণ।

আয়ুর্ব্বেদে গোধূম।—আয়ুর্ব্বেদের মতে গোধূম মধুর রসযুক্ত, বায়ু এবং পিত্তনাশক, গুরুপাক, কফজনক, শুক্রপ্রদ, বলকর, স্নিগ্ধ, ভগ্নসংযোজক, সারক, দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক, বর্ণপ্রসাদক এবং রুচিকর প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।*

গোধূম হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। গোধূম হইতে প্রস্তুত ময়দা, আটা, সুজি, এবং যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় যে সকল পদার্থ থাকে, রাসায়নিক পণ্ডিতগণ তাহার যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

রুটি ও লুচি। ময়দা ও আটা হইতে রুটি ও লুচি প্রস্তুত হয়। লুচিতে ঘৃতের পরিমাণ অধিক থাকে বলিয়া শ্বেতসার জীর্ণ করিবার জন্য যে প্রচুর লালারসের আবশ্যক, সেই রসের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সাধারণ রুটিতে প্রায় ১৫ হইতে ২৮ ভাগ জল থাকে বলিয়া লুচি অপেক্ষা রুটি সহজে জীর্ণ হয়। সাধারণতঃ সিদ্ধ করিয়া ময়দা বা আটা হইতে রুটি প্রস্তুত করা হয় না, কিন্তু সিদ্ধ করিয়া লইলে উপকার

---

*গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ॥

বেশী। যদি সিদ্ধ করিয়া না লওয়া হয়, তাহা হইলে ময়দা বা আটা মাখিয়া এবং বেশ করিয়া ঠেসিয়া একটি তাল করিয়া যদি অন্ততঃ ৬।৭ ঘণ্টা কাল রাখিয়া দেওয়া যায় এবং তাহার পরে ঐ তালটিকে আবার বেশ করিয়া ঠেসিয়া রুটি প্রস্তুত করিয়া সেঁকিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা অতি সহজপাচ্য হইয়া থাকে। যাঁহাদের পক্ষে রুটি হজম করিতে কষ্ট হয়, তাঁহারা এই প্রথা অবলম্বন করিলে অধিক উপকার পাইবেন।

পাঁউরুটি। পাঁউরুটির অধিক আদর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। আমাদের দেশেও ইহার আদর এখন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই পাঁউরুটি ব্যবহার করিবার সময় আগুণে সেঁকিয়া লওয়া উচিত। ইহা সহজপাচ্য। আজ কাল সাদা ময়দার পরিষ্কার পাঁউরুটির পরিবর্ত্তে লাল আটার পাঁউরুটিও কোথাও কোথাও পাওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত প্রকারই খাদ্যহিসাবে বেশী মূল্যবান্।

সুজির রুটি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সিদ্ধ করা আটার রুটি সহজ-পাচ্য। সাধারণতঃ ময়দা বা আটা সিদ্ধ করিয়া রুটি প্রস্তুত করার প্রথা বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু সুজির রুটি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার পরে রুটি প্রস্তুত করা হয়,—এই জন্যই সুজির রুটি সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। যাঁহাদের পক্ষে ময়দা বা আটার রুটি ভালরূপ জীর্ণ হয় না, তাঁহাদের পক্ষে সুজির রুটি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বার্লি—বার্লি বলিয়া যে দ্রব্য অধুনা আমাদের দেশে সমধিকভাবে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা যব হইতে প্রস্তুত। যবের ছাতু আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মতে ইহা মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, ভাত অপেক্ষা ইহাতে নাইট্রোজেন এবং দুষ্পাচ্য পদার্থ

অধিক। সাধারণতঃ বার্লি যেভাবে প্রস্তুত করা হয়, তদ্ভিন্ন বার্লি হইতে রুটিও প্রস্তুত হইতে পারে, তবে ইহা ময়দার ন্যায় খাইতে সেরূপ মুখরোচক নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

দুগ্ধ

দুগ্ধকে আয়ুর্ব্বেদে অমৃত বা পয়ঃ বলা হইয়াছে; বাস্তবিক ইহা অমৃতস্বরূপ। মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে, এই দুগ্ধ দ্বারাই শিশুর জীবন ধারণ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ এই জন্য ইহার আর একটি নাম দিয়াছেন "বালজীবন"। ঘৃত, ছানা, মাখন, ক্ষীর দধি, ঘোল প্রভৃতি আমরা যত প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া থাকি—তাহার সকল গুলিই দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক কথায়, দুগ্ধে সকল জাতীয় খাদ্যই বর্ত্তমান থাকায়, শরীরপুষ্টির পক্ষে ইহা যে বিশেষ সহায়ক, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

দুগ্ধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত—দুগ্ধের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, শিশু ব্যতিরেকে, বয়স্কদিগের পক্ষে কেবলমাত্র দুগ্ধদ্বারা শরীরের পোষণকার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না; কারণ, প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে শরীরধারণের জন্য খাদ্যসমূহে যে যে উপাদান যে যে অনুপাতে থাকা প্রয়োজন, দুগ্ধে তাহার সমস্ত নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিলে, দশ ভাগ জলের সহিত পরিত্যক্ত হয় এবং নব্বই ভাগ

শরীরে শোষিত হইয়া থাকে। আর যদি কেবল মাত্র দুগ্ধ পান না করিয়া অন্য খাদ্যের সহিত ইহা সেবন করা যায়, তাহা হইলে সহজে পরিপাক হয় এবং ইহার অধিক পরিমাণ সারভাগই শরীরে শোষিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা, দুগ্ধ বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই হিতকর, কিন্তু শিশুদিগের পক্ষেই কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধন ও পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

দুগ্ধের প্রকার ভেদ।—আয়ুর্ব্বেদে নানাপ্রকার দুগ্ধের গুণাগুণ লিখিত আছে। তন্মধ্যে গব্যদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধ, মেষীদুগ্ধ, মহিষী দুগ্ধ এবং গর্দ্দভীর দুগ্ধের প্রচলনই দেখিতে পাওয়া যায়। স্তনদুগ্ধ শিশুদিগের পক্ষে অমৃততুল্য। গর্দ্দভীর দুগ্ধ স্তনদুগ্ধের অভাবে উত্তম কার্য্য করে। অবশিষ্ট দুগ্ধগুলিও শরীরপোষণের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। শিশুদিগের পক্ষে স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে, কেবল গর্দ্দভীর দুগ্ধ কেন, গব্যদুগ্ধ এবং ছাগীর দুগ্ধও হিতকর। কিন্তু ঐ সকল দুগ্ধ ব্যবহার করিবার সময় কেবল মাত্র দুগ্ধ সিদ্ধ না করিয়া, দুগ্ধ যতটা, ততটা জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া একটু মিছরি মিশাইয়া পান করান হিতকর। শিশু যদি ৬ মাসের বা তদূর্দ্ধ বয়সের হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুধ না লইয়া দুধের সহিত সামান্য পরিমাণে জল মিশাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

দুগ্ধে ভেজাল।—খাঁটি দুধ এখন একরূপ দুর্লভ হইয়াছে। গোয়ালারা দুধে যেরূপ জল ঢালিয়া থাকে, তাহাতে দুধ পানের উপকারিতা তো দূরের কথা, অনেক স্থলে ঐ জল দূষিত থাকায়, দুধ পানের ফলে শরীরে নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মাখন তোলা দুধ এবং বাছুর মরিয়া গেলে ফুকা দিয়া যে দুধ দোহন করিয়া লওয়া হয়, তাহা বিশেষ অনিষ্টকারী। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দিগের মতে বিশুদ্ধ গাভীর দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০২৬ হইতে

১'০৩৫। একসের গাভীর দুধে মোটামুটি আড়াই কাঁচ্চা ছানা, ৩ কাঁচ্চা চিনি, ২॥০ কাঁচ্চা মাখন এবং ॥০ কাঁচ্চা লবণ জাতীয় পদার্থ থাকে। মহিষীর দুধে গাভীর দুধ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ মাখন থাকে, এ জন্য ইহা গুরুপাক। কিন্তু খাইতে গাভীর দুধ অপেক্ষা সুমিষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, ছাগী দুগ্ধ সর্ব্ব রোগনাশক এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ছাগীদুগ্ধ গোদুগ্ধেরই মত উপকারী। মহিষী দুগ্ধের প্রচলনও আমাদের দেশে অত্যধিক। এই দুগ্ধ—গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা স্নিগ্ধ, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং নিদ্রাজনক কিন্তু গুরুপাক। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, মহিষী দুগ্ধ পানে ক্ষুধা কম হইয়া থাকে।

কিরূপ দুগ্ধ পান করা উচিত?—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দুগ্ধকে অমৃত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও, প্রসবের পরে দশ দিনের মধ্যে গব্যদুগ্ধ ছাগীদুগ্ধ প্রভৃতি পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। গর্ভবতী গাভীর দুগ্ধও পানকরা নিষিদ্ধ। গাভীর বাঁটে যদি ক্ষত থাকে কিম্বা যে গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধ আপনা আপনি ক্ষরিত হইতে থাকে অথবা যে গাভীর দুইটি বাছুর বর্ত্তমান, তাহাদের দুগ্ধও শাস্ত্রমতে অপেয়। সদ্য দোহন করা দুগ্ধ পরম বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ—ত্রিদোষনাশক। এইরূপ দুগ্ধকে ধারোষ্ণদুগ্ধ বলা হয়। এই ধারোষ্ণ দুগ্ধ—গাভীরই প্রশস্ত, কিন্তু মহিষীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ উপকারী নহে, মহিষীর দুগ্ধ শীতল হইলে গুণকারী হয়। ভেড়ার দুধ জ্বাল দেওয়ার পর শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত উপকারী। ছাগী দুগ্ধ শীতল হইলে উপকারক হয়। জ্বাল দেওয়া দুধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ু এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়। অর্দ্ধেক জল অর্দ্ধেক দুধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া পান করিলে, তাহা অত্যন্ত লঘু হয়। নির্জ্জলা দুধ যত অধিক পাক করা যায়, ততই স্নিগ্ধবীর্য্য ও বলবর্দ্ধক হয়।

ভেজাল হইতে আত্মরক্ষার উপায়।—এখনকার দিনে যেরূপ ভেজাল চলিয়াছে, তাহাতে বাজারের দুগ্ধ জ্বাল দিয়াই পান করা উচিত। গোজাতির এক প্রকার পীড়া আছে, তাহার নাম Foot and mouth disease (ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ)। দুগ্ধ দ্বারা পীড়া মানব শরীরে সংক্রমিত হইতে পারে, এজন্য জ্বাল দিয়া দুগ্ধ পান করিলে দুগ্ধের দোষ কাটিয়া যায়। বাজারের দুগ্ধ আনিয়া, বা গোয়ালারা দিয়া যাওয়ার পর বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিয়াও জ্বাল দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ বায়ু সংস্পর্শে নানাপ্রকার বিষ দুগ্ধে প্রবেশ করিতে পারে।

দধি।—সাধারণতঃ গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত এবং মহিষীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত—এই দুই প্রকার দধিই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। শাস্ত্র সকলপ্রকার দধিকেই অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ এবং গুরু বলিয়াছেন। গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দধির পুষ্টিকারিতা শক্তি এবং অগ্নিদীপন শক্তি খুব বেশী। গাভীর দুধ হইতে প্রস্তুত দধি—বায়ুনাশক, মহিষীর দুধে প্রস্তুত দধি কফকারক ও বায়ুপিত্তনাশক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—দধি যে পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে, তাহার কারণ, দধির মধ্যে ল্যাক্‌টিক্ বা অম্লরস আছে। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেন,—আমাদের অন্ত্রমধ্যস্থ যে সকল অনিষ্টকারী বীজাণু বর্ত্তমান আছে, দধির ল্যাকটিক্ এসিড বীজাণুদ্বারা তাহার নষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে যাঁহারা প্রত্যহ দধি ব্যবহার করেন—তাঁহারা নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন। কিন্তু শ্লেষ্মা-প্রধান লোকের পক্ষে বেশী পরিমাণ দধি সেবন কর্ত্তব্য নহে। গুরুপাক দ্রব্যাদি আহারের পরে দধি খাওয়া উচিত, তাহাতে পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য হইয়া থাকে। সদ্যঃপ্রস্তুত দধি বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

ঘোল।—অতি উপাদেয় দ্রব্য। আয়ুর্ব্বেদের মতে এই ঘোল বা তক্র—অমৃতসদৃশ। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

"ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণাং অমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ"॥

অর্থাৎ—তক্র-সেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না এবং তক্রসেবন করিলে কোন রোগগ্রস্তও হইতে হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবতাগণের সুখাবহ, তক্রপানও মনুষ্যদিগের পক্ষে তদ্রূপ সুখপ্রদ হয়।

তক্রের শ্রেণীবিভাগ।—আয়ুর্ব্বেদে তক্রকে ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এই পাঁচভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। সরের সহিত নির্জ্জলা দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। সরবিহীন দধি—জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চারিভাগ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র এবং অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ ও বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছ পদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলা হয়। উহাদের মধ্যে চিনিসংযুক্ত ঘোল পরম উপকারক। ঘোল—বায়ু ও পিত্ত নাশক। মথিত—কফ ও পিত্ত নাশক। তক্র—ধারক, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তজনক এবং বায়ুনাশক। গ্রহণী প্রভৃতি রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর। উদশ্বিৎ—কফবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা—বায়ু ও পিত্ত প্রশমক কিন্তু কফকারক।

ছানা।—ছানায় যবক্ষারজানের ভাগ বেশী, এ জন্য মিষ্ট দ্রব্যের সহিত ছানা খাইলে সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, মাংসের আমিষভাগ হইতেও ইহা বেশী বলকারক। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মতে—মাংসের মধ্যে যে সকল অনিষ্টকারক পদার্থ থাকে, ছানায় তাহা থাকে না।

মাখন।—সদ্যঃপ্রস্তুত মাখনই অধিক উপকারী। আয়ুর্ব্বেদের

মতে ইহা মেধাজনক, লঘু, ধারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। মাখন—মহিষী দুগ্ধ হইতে এবং গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উভয় প্রকার মাখনই সহজপাচ্য অথচ ইহা অতিশয় পুষ্টিকর, কিন্তু পচা মাখন কখনই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা অতিশয় অনিষ্টকারী। এখনকার দিনে যে অম্ল, অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে আমাদের দেশ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার অন্য কারণ, বাজারের পচা মাখন সেবন, একথা আমরা বলিতে পারি। পচা মাখন খাইলে শরীরে গিয়া বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। মাখনেও যথেষ্ট ভেজাল চলিতেছে,—জল মিশান দধির সারভাগ, আলু এবং শূকরের চর্ব্বি এখন অনেক স্থলে মাখনে ভেজাল দেওয়া হয়। এ জন্য বিশেষ সাবধানতাসহ ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

ঘৃত।—সকল প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ঘৃতের তুলনা নাই। শাস্ত্র—ঘৃতকে রসায়ন, বায়ু হিতকারক, দীপক, ধাতুবর্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলবর্দ্ধক, কফনাশক প্রভৃতি গুণসমন্বিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর্য্যঋষি ঘৃতের এতাদৃশ শক্তি অবগত হইয়াই বলিয়াছিলেন,—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"—অর্থাৎ ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইও। এখন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারক দ্রব্য বা বিশুদ্ধ ঘৃত দেশে দুর্লভ হইয়াছে, আমাদের দৈহিক অবস্থাও তাহারই ফলে দিন দিন শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া পড়িতেছে।

ঘৃতের প্রধান গুণ—বিষ নষ্ট করা। ঘৃতে অঙ্গারময় পদার্থের ভাগ অধিক। বিশুদ্ধ ঘৃতে জলের ভাগ মোটেই নাই এবং যবক্ষারজানময় পদার্থ একেবারেই নাই। গব্য ও মহিষ—দুই প্রকার ঘৃত আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। উভয় প্রকার ঘৃতই শরীরপুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গব্যঘৃত—মহিষ ঘৃত অপেক্ষা অনেক বেশী

উপকারী। সামর্থ্যানুযায়ী সকলের পক্ষেই এই পরম উপকারী ঘৃত প্রত্যহ অল্পাধিক পরিমাণে সেবন করা কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমিষ খাদ্য

আমিষখাদ্য মৎস্য ও মাংস ভেদে দুই প্রকার—কিন্তু আমাদের দেশে মাংস অপেক্ষা মৎস্যের প্রচলনই বেশী। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসিবৃন্দ অধিক পরিমাণে মাংসাশী। আমাদের দেশের লোকেরা যে মাংস ভোজন করেন না, এমন নহে—তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই মাংস ভক্ষণ প্রতিদিন না ঘটিয়া মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। মাংসের পরিবর্ত্তে সাধারণ বাঙ্গালী মৎস্য প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু নানা কারণে তাহাও উপযুক্ত পরিমাণে অনেকেই গ্রহণ করিতে পারেন না। এমতাবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে অন্যান্য প্রোটিড্ জাতীয় খাদ্য যথা দাল প্রভৃতি দ্বারা এ অভাব পূরণের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মৎস্য।—মৎস্য সাধারণতঃ পুষ্টিকারক, বলকারক স্নিগ্ধ কিন্তু মৎস্য ভক্ষণে কফ ও পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ব্যায়ামশীল, পথশ্রান্ত এবং বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে মৎস্য বিশেষ হিতকর। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আরও বলেন,—মৎস্যাশী মানব বাতরোগে আক্রান্ত হয় না। নানাপ্রকার মৎস্য আছে, নিম্নে কয়েকটির গুণাগুণ দেওয়া যাইতেছে :—

রোহিত।—ইহা বাতঘ্ন। বাতব্যাধিতে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পীড়ায় হিতকর।

কাতল।—আমাদের দেশে ইহা কাৎলা নামে অভিহিত। ইহা ত্রিদোষনাশক।

মৃদ্গিল।—আমাদের দেশে ইহার নাম—মিরগেল। ইহার গুণ রোহিত মৎস্যের অনুরূপ।

বোয়াল।—বলবর্দ্ধক, কিন্তু কফজনক। অধিক পরিমাণে বোয়াল মাছ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, অধিক পরিমাণে সেবন করিলে রক্ত ও পিত্ত দূষিত হয় এবং কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শিঙ্গী।—বায়ু শান্তিকর, স্নিগ্ধ কিন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপক।

ইলিশ।—অতিশয় মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু এবং পিত্তনাশক কিন্তু বলপ্রদ।

ভেট্‌কী।—খাইতে অতিশয় রুচিপ্রদ, পিত্তনাশক কিন্তু ইহা বেশী খাইলে আমবাত হয় এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে।

সিলন।—আসাম অঞ্চলে ইহার নাম পুঙ্গা। ইহা বলবর্দ্ধক, বায়ুবর্দ্ধক, বায়ুপিত্ত নাশক কিন্তু শ্লেষ্মকর ও আমবাত উপস্থিত করিয়া থাকে।

কই।—রুচিকর, কফ প্রশমক, বায়ুনাশক এবং আগ্নেয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ পিত্তকর।

বাইন।—ইহা রক্তপিত্ত নাশক।

আড়।—বায়ু এবং কফ প্রকোপক।

মাগুর।—স্নিগ্ধ এবং মল সংগ্রাহক।

টেংরা।—কফনাশক. লঘু, অগ্নিদীপক এবং পিত্ত নাশক।

পুটি।—কফ এবং বায়ু নাশক, কণ্ঠগত রোগ নাশক এবং লঘু। এই পুঁটি মাছ দুই প্রকার। যেগুলি বড়—সেগুলির আয়ুর্ব্বেদীয় নাম বৃহৎ শফরী, চলিত নাম সরল পুঁটি। ইহা মুখগত এবং কণ্ঠগত রোগ সকল দূর করিয়া থাকে।

ভেলে।—বলকারক কিন্তু শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

চিতল।—বলপ্রদ।

বেলে।—বায়ুরোগে হিতকর, অগ্নিদীপক, বলবর্দ্ধক, লঘু ও মলসংগ্রাহক।

কালবোস্।—পুষ্টিকারক, কিন্তু বায়ুবর্দ্ধক।

শোল।—রক্তপিত্তনাশক।

চিঙ্গড়ী।—বলবর্দ্ধক, রুচিকর, মেদ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক, কিন্তু কফ-বাত বর্দ্ধক।

চাঁদা।—বলবর্দ্ধক।

খয়রা।—বাতপিত্ত নাশক, বলবর্দ্ধক কিন্তু শ্লেষ্মা প্রকোপক।

মৌরলা।—বায়ুনাশক কিন্তু শ্লেষ্মকারক।

ফলুই।—বলকারক।

খলিশা।—বায়ু, পিত্ত, কফ, শূল ও আমবিনাশক এবং বলকারক।

পাব্দা।—বায়ুনাশক ও বলকারক।

বাচা।—বায়ু পিত্ত নাশক কিন্তু শ্লেষ্মকর।

পাঁকাল।—শ্লেষ্মা প্রকোপক এবং অজীর্ণকারক।

মাছের ডিম।—পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, কফ ও মেদোবর্দ্ধক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—মাছের ডিমে অধিক পরিমাণে 'নিউ-

ক্লিন' থাকে বলিয়া ইহা বাতগ্রস্ত লোকের পক্ষে উপযোগী নহে, নতুবা ইহা অতিশয় সারবান খাদ্য।

মৎস্য বেশী সারবান কিনা ? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, —মৎস্যে ফস্‌ফরাস্‌ ঘটিত লবণ বেশী পরিমাণে থাকে, এজন্য যাঁহারা অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মৎস্যের প্রকার ভেদ। সাধারণতঃ মৎস্য দুই জাতীয়, এক সাদা, অপর মৎস্যের মাংস কাটিলে লালবর্ণ দেখায়। সাদা মৎস্য অপেক্ষা যে সকল মৎস্যের মাংস কাটিলে লালবর্ণ দেখায়, সেইগুলি খাইতে সুস্বাদু এবং অধিক পুষ্টিকর—কিন্তু সাদা রঙের মৎস্য অপেক্ষা ইহা গুরুপাক। সাদা মৎস্যের মধ্যে বাটা, পুঁটি, মৌরলা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, এগুলি সহজপাচ্য, অল্প পুষ্টিকর, এজন্য রোগীর পথ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎস্যের মধ্যে রুই, কাৎলা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। রোগীর পক্ষে শিঙ্গী, মাগুর এবং কই বেশী উপকারী, কারণ এ সকল মৎস্যে বসার ভাগ কম। ইলিস, চিংড়ি—বিশেষতঃ গলদাচিংড়ি এবং পার্শে, ভেটকী—অতিশয় দুষ্পাচ্য, এজন্য অধিক খাওয়া উচিত নহে।

লোণামাছ ও শুষ্কমাছ।—লোণা মাছ ও শুকনা মাছ অতিশয় অপকারী। ইহারা দুষ্পাচ্য এবং স্বাস্থ্যের অপচয়কারক।

মৎস্য কিরূপ ভাবে খাওয়া উচিত ?—সাধারণ গৃহস্থের সংসারে মৎস্য অল্প তৈল দিয়া ভাজা হয়, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ছাঁকা তৈলে মৎস্য ভাজা উচিত, তাহাতে মৎস্যের সারাংশ নষ্ট হয় না। মাছ অধিক্ষণ সিদ্ধ করাও ঠিক নহে, তাহাতে উহার ছানা জাতীয় উপাদান জমাট বাঁধিয়া পড়ে—এবং এই জন্য ইহা দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। মৎস্যের তরকারী করিবার পূর্ব্বে মৎস্যকে ফুটন্ত গরম জলে যদি

একবার ফেলিয়া এবং ২।৩ মিনিট পরে তুলিয়া লইয়া তরকারির সহিত মৃদু জালে সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে উহা সহজপাচ্য হইয়া থাকে।

পক্ষী ডিম্ব।—ডিম্ব পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু গুরুপাক। ইহাতে সল্‌ফার (গন্ধক) এবং ফস্‌ফরাসের পরিমাণ অধিক, এই জন্যই জীর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটে। আমাদের দেশে হংস ডিম্বেরই প্রচলন বেশী। এই ডিম্বে যথেষ্ট পরিমাণে ছানা জাতীয় ও মাখন জাতীয় উপাদান বর্ত্তমান। এজন্য ডিম প্রত্যহ খাইলে ছানা ও মাখন জাতীয় উপাদান দ্বারা শরীরের পোষণ কার্য্য উত্তমরূপ সাধিত হইতে পারে। অনেকে ডিম্ব সিদ্ধ না করিয়া কাঁচা অবস্থায় খাইয়া থাকেন, উহা খাইতে সুস্বাদু নহে, কিন্তু অধিক পুষ্টিকর। কাঁচা ডিম অপেক্ষা অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম হজম করিতে একটু বেশী সময় লাগে বটে, কিন্তু শরীর পুষ্টির পক্ষে ইহাও কম উপকারী নহে।

অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া এবং অধিক মসলা মিশাইয়া খাইলে ডিম জীর্ণ করিতে অধিক সময় লাগে। এজন্য যাহাদের হজম শক্তি কমিয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে অধিক সিদ্ধ ডিম্ব না খাইয়া অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব একটু গোল মরিচের গুঁড়া ও লবণসহ মিশাইয়া খাইলে বিশেষ ভাবে শরীর পুষ্টির কার্য্য করিয়া থাকে।

ডিম্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত—বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, ডিম্বের শ্বেতবর্ণ অংশে আমিষ উপাদান এবং পীতাংশে স্নেহ উপাদান অধিক এবং জলীয় ভাগ কম ও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ উপাদান বর্ত্তমান। এই জন্যই ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা শিশুদের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য, কারণ ইহাতে যে ফস্‌ফরাস আছে—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন ক্যালসিয়ম এবং লৌহ ঘটিত লবণ উপাদান থাকার জন্যই ইহা সহজে রক্তের সহিত মিশিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে ডিম্বের কথা।—আয়ুর্ব্বেদে ডিম্বের প্রকার ভেদের কথা নাই; কিন্তু পক্ষী ডিম্বের উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে,—

নাতি স্নিগ্ধানি বৃষ্যানি স্বাদুপাকরসানি চ।
বাতঘ্নান্যতিশুক্রানি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্॥

সাধারণের ধারণা হংসডিম্ব অধিক খাইলে বাতরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ইহা ভুল ধারণা। হংস ডিম্ব অপেক্ষা কুক্কুট ডিম্ব অধিক বলকর—ইহাও অনেকের ধারণা,—ইহাও ভুল। প্রকৃতপক্ষে কুক্কুট ডিম্ব অপেক্ষা হংসডিম্বের পুষ্টিকারিতা শক্তি অনেক অধিক এবং হংস ডিম্ব ভক্ষণের ফলে বাত রোগে আক্রান্ত হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ২০টি ডিম্ব ও একসের মাংস—একইরূপ পুষ্টিকর। (ডিম বেশী সিদ্ধ হইলে বেশী আঁস্‌টে গন্ধ হয়)

মাংস।—আয়ুর্ব্বেদে মাংসের গুণ যথেষ্ট বর্ণিত আছে।

মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরুহৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ॥

সকল প্রকার মাংসই বায়ুনাশক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিপ্রদ গুরুপাক।

আয়ুর্ব্বেদে মাংসের প্রশংসা। আয়ুর্ব্বেদ সকল প্রকার মাংসের পুষ্টিকারিতা শক্তি উল্লেখ করিলেও, পশুমাংসাপেক্ষা পক্ষীর মাংসের অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, পক্ষীমাংস পশু মাংস অপেক্ষা লঘু, এজন্য সহজপাচ্য। পারাবতের মাংস যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদিগের জন্য চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন; ইহা রক্তপিত্ত নাশক, বাতঘ্ন ও বীর্য্যবর্দ্ধক। কুক্কুটমাংসের গুণও আয়ুর্ব্বেদ যথেষ্ট

বলিয়া গিয়াছেন। ইহা পুষ্টিকারক, বায়ুনাশক, চক্ষুর হিতকর এবং বলকর। তবে বন্য না হইয়া গৃহপালিত হইলে হিন্দুর পক্ষে অখাদ্য।

পশুর মাংস।—পশুর মাংসের মধ্যে ছাগমাংসের প্রচলনই অধিক। আয়ুর্ব্বেদেও ইহার যথেষ্ট গুণ বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
মাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্।

ছাগমাংস লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বীর্য্যকারক।

অবস্থাভেদে গুণ ভেদ।—অবস্থাভেদে এই ছাগ মাংসের নানাপ্রকার গুণ বর্ণিত আছে, যথা,—

অপ্রসূতা ছাগীর মাংস অগ্নিদীপক। ইহা শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষ রোগে হিতকর, পীনস নাশক ও অগ্নিদীপক।

কচি ছাগমাংস—অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, জ্বরহারক, সুখপ্রদ ও অত্যন্ত বলদায়ক। **খাসী ছাগের মাংস**—কফজনক, গুরু, স্রোতঃ-শুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, মাংসবর্দ্ধক ও বাতপিত্ত নাশক। **বৃদ্ধ এবং ব্যাধিগ্রস্ত ছাগের মাংস**—বাতজনক ও গুরু। **ছাগমুণ্ড**—চক্ষু কর্ণাদি রোগ নাশক ও রুচিপ্রদ।

মেষমাংস।—আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—ইহা পুষ্টিকর কিন্তু পিত্তশ্লেষ্ম-বর্দ্ধক ও গুরু। আয়ুর্ব্বেদের মতে মেষের মাংস বাসি হইলে কিছু লঘু হইয়া থাকে।

হরিণের মাংস।—ইহা অগ্নিদীপক, সন্নিপাতনাশক, লঘু এবং মলমূত্রের রোধক।

খরগোসের মাংস।—ইহা লঘু, সংগ্রাহক, মধুররস, সর্ব্বথা হিতকারক, অগ্নিকারক, কফপিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকৃতি, জ্বর, অতিসার, শোথ, রক্তদুষ্টি ও শ্বাসরোগ নাশক।

কচ্ছপ মাংস।—বলবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক।

মাংস সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মত।—আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মাংসে তিন ভাগ জল ও একভাগ সার উপাদান বর্ত্তমান। সারভাগের মধ্যে আবার আমিষ উপাদানই অধিক এবং মাংসে শালি উপাদান একবারেই নাই। আমিষ উপাদান অধিক থাকার জন্যই মাংসের পুষ্টিকারিতা শক্তি বেশী।

মাংস প্রস্তুতের বিধি।—মাংস সাধারণতঃ যেরূপভাবে ঘৃত ও মসলাদি সহ প্রস্তুত করা হয়—তাহাতে হজম করিতে আরও বিলম্ব ঘটে, এজন্য অল্প মসলা দিয়া মাংস সিদ্ধ করিয়া লইলে উহা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পরিপাক হইয়া থাকে।

মাংস ভক্ষণ এদেশের উপযোগী কিনা ?—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণই মাংসে শরীরপুষ্টির যথেষ্ট পরিমাণে গুণ-বর্ণনা করিয়া যাইলেও, মাংস আমাদের দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে ঠিক উপযোগী খাদ্য কি না, সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে ; কারণ, বাঙ্গলাদেশ সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান, প্রত্যহ মাংসভক্ষণ কোনক্রমেই শরীরের পক্ষে উপযোগী নহে। মাংস সারবান্ পদার্থ হইলেও ইহা শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষেই সম্যক্ উপযোগী। বাঙ্গলা-দেশে শীতকালে ইহা ভোজন করিলে শারীরিক উন্নতি ঘটিতে পারে। অন্যান্য সময়ে উপযুক্ত পরিণাম "প্রোটিড্" সম্পন্ন খাদ্য, যথা—দাল, ছানা ইত্যাদি গ্রহণ করা বিধেয়।

মাংসাদি পরীক্ষা। অধিক রক্তবর্ণ মাংস অভক্ষ্য। টাট্‌কা কচি

মাংস ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং বয়স্কপশুর মাংস ঈষৎ বেগুনী রঙের। টাট্‌কা মাংসমাত্রেই স্থিতি-স্থাপক। টাট্‌কা মাছ শক্ত, টিপিলে আঙ্গুলের দাগ বসিবে না, উহার কান্‌কোর নীচে রক্তবর্ণ এবং উহা দুর্গন্ধবিহীন। একছটাক লবণমিশ্রিত অর্দ্ধ সের জলে ছাড়িয়া দিলে যে ডিম ডুবিয়া যায়, তাহাই উত্তম।

সপ্তম অধ্যায়

শাক-সব্জী

ভাত, রুটি বা লুচি—আমরা যাহা কিছু খাইয়া থাকি, দাল এবং তরকারি তাহার উপকরণ। দালের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অধ্যায়ে তরকারির কথা বলিব।

গোলআলু।—তরকারির মধ্যে গোলআলু আমাদের প্রধান তরকারি। আলুর দম, আলুর ডালনা, আলুর ঝোল, আলুর চড়চড়ি—আলু নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা খাইতেও বেশ মুখরোচক। গোলআলুর পুষ্টিকারিতা শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু খোসা ছাড়াইয়া উহা ব্যবহার করার ফলে, উহার বলকারক শক্তি কিছু কমিয়া যায়। খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করার জন্য পরিপাক করিতেও কিছু বেশী সময় লাগিয়া থাকে। প্রথমে খোসা শুদ্ধ আলু সিদ্ধ করিয়া লইয়া তাহার পর উহার খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত।

লাল আলু।—আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—ইহা বলকারক ও কফনাশক।

চুব্ড়ী আলু।—অন্যান্য আলু অপেক্ষা ইহাতে শালি উপাদান কিছু কম।

পটোল।—আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে অগ্নির উদ্দীপক, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি এবং বায়ু পিত্ত কফ—ত্রিদোষনাশক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পটোলং পাচনং হৃদ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-জ্বরদোষত্রয়ক্রিমীন্॥

পল্তা।—পটোলের পাতা তিক্ত কিন্তু মুখরোচক। ইহা অতিশয় উপকারী এবং পিত্তনাশক।

বেগুণ।—বেগুণের মধ্যে যেগুলি কচি, সেগুলি কফপিত্ত নাশক এবং পাকা বেগুণ পিত্তকারক ও গুরু। বেগুণ পোড়াইয়া খাইলে উহা শীঘ্র পরিপাক হয় বটে, কিন্তু উহা কিঞ্চিৎ পিত্তকর। ইহা কফ, মেদ বায়ু ও আমদোষের শান্তিকারক। এই বেগুণ পোড়ায় লবণ ও তৈল মিশাইয়া খাইলে, তাহা গুরু ও স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট হয়। বেগুণ খাইলে অগ্নির উদ্দীপনা জন্মিয়া থাকে, বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্।
জ্বর বাতবলাশঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু॥

কুমড়া।—কুমড়া দুই প্রকার,—বিলাতী কুমড়া ও ছাঁচি কুমড়া বা দিশি কুমড়া। বিলাতী কুমড়া অতি মুখরোচক, কিন্তু দিশি কুমড়া অপেক্ষা ইহা গুরুপাক। উভয় প্রকার কুমড়াই পুষ্টিকারক, গুরু। দিশি কুমড়া—রক্তপিত্ত নাশক। আয়ুর্ব্বেদে রক্তপিত্ত রোগে এবং বায়ু শান্তির জন্য ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। দিশি কুমড়ার মধ্যে কচি কুমড়া পিত্তনাশক, মাঝারি কুমড়া কফকারক এবং পাকা কুমড়া মলমূত্রের নিঃসারক। অগ্নিদীপক ও সর্ব্ব দোষ প্রশমক।

কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্ ॥
বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎসর্ব্বদোষজিৎ ॥

লাউ।—ইহা শ্লেষ্মা ও পিত্ত নাশক, ধাতু ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

মিষ্টং তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু।
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টি-বিবর্দ্ধনম্ ॥

আয়ুর্ব্বেদ বলেন, লাউ বা মিষ্টতুম্বীফল পিত্তশ্লেষ্মানাশক, গুরু রুচিকর, ধাতু ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

ঝিঙ্গা।—পিত্তনাশক এবং কফবাতকারক, অগ্নিদীপক, কাস ও কৃমি নাশক।

রাজকোশাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা।
পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাস-জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ ॥

ঝিঞা বা রাজকোশাতকী। ইহা কফবাতকারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক। ইহা শ্বাস, জ্বর, কাস ও ক্রিমিনাশক।

শিম।—ইহা শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং বায়ুপিত্ত নাশক, বলকারক, গুরু এবং বেশী পরিমাণে খাইলে দাহ হইয়া থাকে।

শিম্বিদ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু।
বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ ॥

শ্বেত শিম ও মোগলাই শিম নামে শিম ২ প্রকার। ২ প্রকার শিমই আস্বাদে ও পাকে মধুর রস, গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতপিত্ত বিনাশক।

করোলা ও উচ্ছে।—এই দুইটী দ্রব্যই জ্বরনাশক, পিত্তনাশক,

কফনাশক, ক্রিমিনাশক প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। ইহা অগ্নিদীপক এবং ইহা বাতকারক নহে। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে প্রত্যহ উচ্ছের বীজ খাইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অক্ষত থাকা যায়।

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহ ক্রিমীন্ হরেৎ॥

ইহা ভেদক, লঘু ও তিক্ত রস বিশিষ্ট। জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত পাণ্ডু, মেহ, ক্রিমি ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ধুঁধুল।—ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

মহা কোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা।

ইহা স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক। বাতপিত্ত নাশক, বলকারক, ও রুচিপ্রদ। শোষ রোগীর ইহা পরম হিতকর। পটোল অপেক্ষা ইহা কিছু কম গুণবিশিষ্ট।

চিচিঙ্গে।—ইহার গুণ প্রায়ই পটোলেরই মত। শোষ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

চিচিঙ্গো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যোরুচিপ্রদঃ।
শোষিণেহতিহিতঃ কিঞ্চিদ্গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ॥

শজিনার ডাটা।—কফপিত্তনাশক, গুল্মনাশক, ক্ষয় ও শ্বাস-নিবারক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত।

শোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায় কফপিত্তনুৎ।
শূলং কুষ্ঠক্ষয়শ্বাস-গুল্মহৃদ্দীপনং পরম্॥

ইহা অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম বিনাশক।

ঢেঁড়শ।—মূত্রজনক, পাথুরী ব্যারামে বিশেষ উপকারী।

ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ।
সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরী হরঃ ॥

ঢেঁড়শ—রুচিকর, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, বাতবর্দ্ধক, মূত্রজনক ও পাথরীনাশক।

কাঁকরোল।—জ্বরনাশক, অগ্নিদীপক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

কর্কোটি বলহৃত কুষ্ঠ-হৃল্লাসারুচিনাশিনী।
শ্বাসকাস জ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী ॥

কাঁকরোল—মল, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং জ্বরনাশক। ইহা অগ্নিদীপক।

ওল।—অর্শ রোগীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। প্লীহা এবং গুল্ম রোগীর পক্ষেও ইহা বিশেষ হিতকর। রক্তপিত্ত, দদ্রু এবং কুষ্ঠ রোগীর পক্ষে ইহা খাওয়া উচিত নহে।

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃ কৃন্তনো লঘুঃ ॥
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥
দদ্রূণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ ॥

ওল—কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্ম বিনাশক বিশেষতঃ অর্শরোগে সুপথ্য। সর্ব্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ রোগে ইহা হিতকর নহে। সন্ধান যোগ প্রাপ্ত শূরণ অধিক গুণদায়ক।

মানকচু।—সর্ব্বাপেক্ষা শোথ রোগীর পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

মাণকঃ শোথহৃচ্ছীত পিত্তরক্ত হরো লঘুঃ।

মানকচু—শোথহারক, লঘু এবং ইহা রক্তদোষনাশক।

কাঁকুড়।—পিত্তনাশক ও অগ্নিকারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ।
রুচ্যা পিত্তহরা শ্যামা পক্কা তৃষ্ণাগ্নিপিত্তকৃৎ॥

অপক্ক বড় কাঁকুড় মলসংগ্রাহক, গুরু, রুচিপ্রদ ও পিত্ত নাশক। পাকা কাঁকুড়—তৃষ্ণা, পিত্ত ও অগ্নিকারক।

মোচা।—বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং ক্ষয় নিবারক। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রস্রাবের পীড়াক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

থোড়।—বহুমূত্র রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী, উহা ভিন্ন ইহা ধাতু বর্দ্ধক।

কাঁচাকলা।—উদরাময় রোগীর পক্ষে ইহা পরম হিতকর। ইহাতে লৌহের অংশ থাকায় ইহা ধাতু-পুষ্টির সাহায্য করিয়া থাকে। যাঁহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, তাঁহাদের খাওয়া উচিত নহে।

কাঁচাপেঁপে।—প্লীহা, গুল্ম, অর্শ ও অম্ল রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

পারীশঃ শীতলঃ রুচ্যঃ দীপনঃ পাচনঃ সরম্।
মধুরঃ রক্তপিত্তঘ্নঃ বিশেষাদর্শসে হিতম্॥

পেঁপে—রুচিকর, অগ্নিদীপক, পাচক, সারক, মধুররস ও রক্তপিত্ত নাশক। ইহা অর্শরোগে বিশেষ উপকারী।

মূলা।—ইহা অপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ কাঁচা খাইলে অপকারী, উহাতে ত্রিদোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। মূলার মধ্যে ছোট জাতীয় মূলাই খাওয়া উচিত, ইহা ত্রিদোষ নষ্ট করে।

লঘুমূলঃ কটূষ্ণঃস্যাদ্রুচ্যঃ লঘুপাচনম্ ।
দোষত্রয়হরঃ স্বর্য্যঃ জ্বরশ্বাসবিনাশনম্ ॥

ছোট জাতীয় মূলা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, লঘু, পাচক ত্রিদোষনাশক ও স্বরপ্রসাদক। ইহা জ্বর ও শ্বাসাদি বিনাশক।

শাক।—শাক বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য বলিলেই চলে। সেই জন্য কয়েকটি শাকের গুণাগুণ প্রদত্ত হইল।

নটেশাক।—অগ্নিদীপক এবং মল মূত্রাদির প্রবর্ত্তক।

পালংশাক।—বাতজনক, শ্লেষ্মাকর, ভেদক, গুরু। ইহা রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক।

চুকাপালং।—কফ ও পিত্তকারক, কিন্তু বাতঘ্ন। ইহা বেগুনের সহিত পাক করিলে রুচিপ্রদ হয়।

হিঞ্চেশাক।—শোথ, কুষ্ঠ, কফ, ও পিত্তনাশক।

সুষুনি শাক।—নিদ্রাজনক, অনিদ্রারোগে ইহার ঝোল খাইলে সুনিদ্রা হয়। ইহা অগ্নিদীপক, মেধাজনক, রসায়ন।

পুঁইশাক।—বায়ু ও পিত্তনাশক কিন্তু শ্লেষ্মাজনক। কণ্ঠের অহিতকর, নিদ্রাজনক, রক্তপিত্তনাশক, বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিকারক।

পুদিনা শাক।—কফ ও বায়ু নাশক, মুখের জড়তা নাশক, বমি ও অরুচি নিবারক।

শাঞ্চে শাক।—কফ ও বাত প্রশমক, প্লীহা ও অর্শরোগ নাশক।

বেতোশাক।—বলকারক। প্লীহা, রক্তপিত্ত, ক্রিমি প্রভৃতিতে ইহা উপকারী।

গীমে শাক।—পাণ্ডু, জ্বর ও প্লীহারোগ নাশক। পিত্ত, কফ এবং কাম্‌লা রোগীর পক্ষেও ইহা হিতকর।

পাট শাক।—বাতপ্রকোপক কিন্তু রক্তপিত্ত নাশক। পিত্তজ-

রোগে এই পাটশাক শুকাইলে যে নালিতা হয়—তাহা ভিজাইয়া সেই জল খাইলে উপকার হইয়া থাকে।

ছোলার শাক।—ইহা দুষ্পাচ্য। ইহা পিত্ত ও দাঁতের ফুলা নিবারক।

মটর শাক।—ভেদক কিন্তু ত্রিদোষনাশক।

সজিনার ফুল।—প্লীহা ও গুল্ম নিবারক। লাল সজিনার ফুল চক্ষুরোগীর হিতকর এবং রক্তপিত্তের প্রসাদক। সজিনার ফুল—রুক্ষ ও বায়ুপ্রধান ব্যক্তির, প্লীহা রোগীর ও গুল্মরোগীর পক্ষে হিতকর।

শাকগুলির মধ্যে কি কি উপাদান কি কি পরিমাণে আছে, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরিশিষ্টে দেওয়া যাইতেছে।

একই তরকারি প্রত্যহ না খাইয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া খাওয়া উচিত। হিন্দুশাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই ইহা বিশেষভাবে পালন করিবার কথা বলা হইয়াছে। পঞ্জিকায় যে, অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য খাইতে নাই লেখা থাকে, তাহা পালন করিয়া চলিলে নানাপ্রকার রোগের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকা যায়। একই তরকারী প্রত্যহ খাইলে অরুচি জন্মিয়া থাকে, তা'ছাড়া—তিথি অনুসারে শারীরিক বলের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ বা হ্রাস হইয়া থাকে, এই জন্য শাস্ত্র বিশেষ করিয়া উহা পালন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। দ্রব্যেই আমাদের শরীরের উৎপত্তি, স্থিতি ও বর্দ্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আবার দ্রব্য দ্বারাই উহার ধ্বংস সাধনও হইয়া থাকে। ইহা মনে রাখিয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার নিষিদ্ধ তাহা প্রত্যেক দিন পঞ্জিকা দেখিয়া—ব্যবস্থা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

অষ্টম অধ্যায়

ফল

সুফলা বঙ্গদেশে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানাবিধ ফল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সহর ও সহরতলী অঞ্চলে দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ অধুনা সাধারণ বাঙ্গালী যথোপযুক্ত পরিমাণে ফল খাইতে পারেন না। পক্ষান্তরে, বাজারের জঘন্য খাবারে পয়সার অপব্যয় না করিলে, অনেকেই প্রকৃতিদত্ত এই অপূর্ব্ব দ্রব্যের কিছু কিছু সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে সাধারণতঃ অনেক ফড়িয়ার (Middlemen) হাত ফিরিয়া ফল বাজারে বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হয়, কাজেই দামও অন্যায়রূপে বাড়িয়া যায়। পল্লীবাসী এ বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন ; কিন্তু, অজ্ঞতা অথবা আলস্য বশতঃ তাঁহারাও এ বিষয়ে ক্রমশঃ যেন কতকটা উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। ফলে, ফল-বাবদ অনেকটা টাকা বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এবং দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ সাধারণ বাঙ্গালী দিন দিন ফল ভক্ষণে বঞ্চিত হইতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী যতদিন না গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছেন এবং নিত্যব্যবহার্য্য আহার্য্য বস্তু বহুল উৎপাদনে মনোযোগী হইতেছেন ততদিন পর্য্যন্ত এ অবস্থার উন্নতি হইবে কি না, সন্দেহ।

বলা বাহুল্য, ফল শরীরের হিতকারী, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব, সময়ের টাট্‌কা ফল প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য কিছু কিছু খাওয়া উচিত। কারণ, ফলের মধ্যে লবণজাতীয় পদার্থ কিছু কিছু বিদ্যমান থাকায় ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, সুতরাং, যাঁহারা কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠ-কাঠিন্যে ভুগিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে ফল

ঔষধ তুল্য। অধিকন্তু, ফল শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে এবং অম্ল ও লবণজাতীয় পদার্থের অল্পাধিক বিদ্যমানতা হেতু, রক্তের ক্ষার ধর্ম্ম বজায় রাখে। ফল রক্ত পরিষ্কার করে বলিয়া, সাধারণতঃ সকল ফলই অল্পাধিক বর্ণ-প্রসাদক। পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিদেরা (Beauty specialists) বলেন, রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একটি কমলা লেবু খাওয়া উচিত, তাহাতে গাত্র-ত্বক্ ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও আম, কাঁঠাল প্রভৃতি কয়েকটি ফলকে বর্ণ-প্রসাদক বলিয়া বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেক সুমিষ্ট ফলের পুষ্টিকারিতা শক্তিও যথেষ্ট আছে। এবং ক, খ ও গ ভাইটামিন উক্ত ফল সমূহে অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান (ভাইটামিন অধ্যায় দেখ)। এজন্য, ক্রমবর্দ্ধনশীল শিশু, ছাত্র এবং মস্তিষ্কজীবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ফল অপরিহার্য্য। অপস্মার প্রভৃতি মানসিক ব্যাধিতে ফল (অন্ততঃ অধিকাংশ ফলই) উপকারী। সুতরাং ফল যে মস্তিষ্কের উত্তম খাদ্য (Brain Food) তাহাতে সন্দেহ নাই।

এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, শর্করাপ্রধান সুমিষ্ট ফল সমূহ সাধারণতঃ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অসেব্য। এ বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষেত্র বিশেষে কাঁচা ফল (যেমন পেঁপে, বেল, কচি শশা ইত্যাদি) সকলের ভক্ষ্য হইলেও, সাধারণতঃ কাঁচা ফল পরিহার করা উচিত। অন্যদিকে, অতিরিক্ত পক্ক অর্থাৎ 'মজিয়া' যাওয়া ফল খাওয়া উচিত নহে। উভয় ক্ষেত্রেই উদরাময় হওয়া সম্ভব।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, বৃক্ষের ফলফুলও বায়ু হইতে আমাদেরই মত অক্সিজেন আহরণ করে,—তাহাদেরও শ্বাসপ্রশ্বাস আছে। ফল, ফুল আহরণ করার পরেও এ শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া কিয়ৎকাল চলিতে থাকে এবং তদবধিই ফল বা ফুল টাট্‌কা বা তাজা থাকে। পরে যখন

উক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ক্রমশঃ বন্ধ হইতে থাকে, তখন উহারা ধীরে ধীরে শুকাইয়া, পচিয়া অথবা মজিয়া যায়। টাট্‌কা ফলই স্বাস্থ্যের অনুকূল, অতএব, মজিয়া যাওয়া ফল বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের দেশের নারীরা 'মজিয়া যাওয়া' ফলের বিশেষ পক্ষপাতিনী—এ বিষয়ে তাঁহাদের একটু অবহিত হওয়া উচিত।

ফল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করা উচিত, কারণ পক্ষীবিষ্ঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ দ্বারা ফল প্রায়ই কলুষিত হয়। সর্পাদি বিষধর জীবের সংস্পর্শে ফল বিষাক্ত হওয়ায়, সেই ফল ভক্ষণে কাহারও কাহারও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে শুনা যায়। সুতরাং, কীটাদি দ্বারা দষ্ট ফল সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। অনেকে মাত্র দষ্ট স্থানটুকু বাদ দিয়া ফলের বাকী অংশটুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু, এ প্রথাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে।

আমরা নিম্নে কয়েকটি প্রচলিত ফলের গুণাগুণ বর্ণনা করিলাম এবং প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটির রোগনাশিনী শক্তির উল্লেখ করিলাম। খাদ্য প্রসঙ্গে ঔষধের অবতারণা অবান্তর হইলেও, সাধারণের উপকার দর্শিবে এই বিশ্বাসে সেগুলি দেওয়া গেল।

আম

সংস্কৃতে আমকে অমৃত ফল বলে। বাস্তবিকই অমৃতোপম এই ফলটি ভারতবর্ষের ফলবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অবস্থাভেদে গুণ।—আমের পুষ্প বা বোল—কফ ও রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক। অত্যন্ত কচি আম কষায়—অম্লরস, রুচিকারক এবাং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধক। কাঁচা আম একটু বড় হইলে—অম্লরস, রুক্ষ, বায়ু, পিত্ত ও কফজনক, রক্তদোষক। আমের মধ্যে যেগুলি গাছপাকা, সেগুলি মধুরাম্ল রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক এবং কিঞ্চিৎ

পিত্তজনক। ডাঁসা অবস্থায় পাড়িয়া যে আম পাকান হয়, সেই আম—অম্লরস বিহীন ও মধুররসবিশিষ্ট ও পিত্তনাশক। পাকা আম বাসি হইলে—তাহা অতিশয় রুচিজনক হইয়া থাকে এবং উহা বলপ্রদ, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং সারক। কাঁচা আমের ছাল ফেলিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া যে আমচুর প্রস্তুত করা হয়, তাহা অম্লমধুর, কষায় রস, ভেদক ও কফ এবং বায়ুনাশক। বেশ সুপক্ক আমের রস গালিয়া খাইলে উহা বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিকর, অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং কফবর্দ্ধক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আম খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া খাইলে, তাহা রুচিকর হয় বটে, কিন্তু উহা গুরুপাক। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা আম—মধুর রস বিশিষ্ট, বলকর, শীতবীর্য্য এবং বায়ু-নাশক।

দুগ্ধযুক্ত আম বর্ণপ্রসাদক, মধুররস কিন্তু গুরুপাক। এরূপভাবে আম খাইলে রুচি জনক, পুষ্টিকর এবং শারীরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি হয় ও ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

আমসত্ত্ব। ইহা রৌদ্রে পাক করার জন্য লঘুপাকী হইয়া থাকে। ইহা তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক এবং রুচিকারক।

অধিক আম্র ভক্ষণের দোষ।—অধিক আম খাইলে অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। অধিক আমখাওয়ার ফলে বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি ও চক্ষু-রোগও উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার কিন্তু বলিয়াছেন, এই নিষেধ কেবল অম্লরসযুক্ত আম সম্বন্ধে,—মধুর রসযুক্ত আম সম্বন্ধে এই নিষেধ নহে—কারণ সুমিষ্ট আম ভক্ষণ চক্ষুর হিতকর।

অতিরিক্ত আম ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য হইবার পূর্ব্বে যদি দুই তোলা শুঁঠ, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করা যায়—অথবা একআনা সচল লবণ ও এক আনা জীরকের গুঁড়া

সেবন করা যায়, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্যের প্রতিষেধক হইয়া থাকে। আম খাইয়া কিঞ্চিৎ দুধ খাইলে আম সহজে জীর্ণ হয়।

আম্রের রোগনাশিনী শক্তি।—এইবার আম্রের রোগনাশিনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিব :—

প্লীহায়।—সুমিষ্ট পাকা আমের রস মধুর সহিত প্রত্যহ পান করিলে প্লীহারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বায়ুপ্রধান প্লীহোদরেই কিন্তু ইহা বেশী কার্য্যকারী।

রক্তস্রাবে।—আমের আঁটীর শাঁস গুঁড়া করিয়া নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

রক্তাতিসারে।—আমছাল ২ তোলা বেশ করিয়া বাটিয়া লইয়া আধপোয়া ছাগদুগ্ধ এবং দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধটুকু অবশেষে নামাইয়া একটু চিনি দিয়া পান করিলে রক্তাতিসারে উপকার হয়।

বমনে।—(১) আম ও জামের পাতার রস এক এক তোলা লইয়া আধসের জলে জ্বাল দিয়া এবং আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিলে পিত্তজনিত বমন আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) আমের আঁটির শাঁস দুই আনা ও একটু মধু একত্র মিশাইয়া সেবন করিলেও বমন প্রশমিত হয়।

অতিসারে।—আমের ছালের উপরের অংশটুকু চাঁচিয়া ফেলিয়া সেই ছাল দধির সহিত পেষণ করিয়া খাইলে অতিসার এবং অতিসার-জনিত উদরের বেদনা ও দাহ প্রশমিত হয়।

অতিসারে পক্কাবস্থা।—আমের কচি পাতা এবং কয়েদবেলের শাঁস সমানভাগে লইয়া আধ তোলা মাত্রায় চাউল ধোয়া জলসহ খাইলে পক্কাতিসার আরোগ্য হয়।

মাছ খাইয়া অজীর্ণ হইলে।—অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার জন্য অজীর্ণ হইলে কাঁচা আম খাইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

মাংস ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে।—আমের আঁটির শাঁস সেবনে মাংসভক্ষণ জনিত অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কাঁচা আম খাইলেও মাংসভক্ষণজনিত অজীর্ণ রোগ সারিয়া থাকে।

শোথ।—আম গাছের মূলের ছাল ও শ্বেতপুনর্ণবা—প্রত্যেকটি ছয়সের এক পোয়া লইয়া বেশ করিয়া কুটিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া /৪ সের গব্যঘৃতে (এই ঘৃতকে পূর্ব্বে যথারীতি মূর্চ্ছা দিয়া লইতে হইবে) পাক করিবে। তারপর আধসের আমগাছের মূলের ছাল এবং আধসের শ্বেতপুনর্ণবা—১৬ সের জল মিশাইয়া ঐরূপে পুনরায় পাক করিয়া লইতে হইবে। এই ঘৃত শোথনাশক, গুল্ম এবং অগ্নিমান্দ্যাদির পক্ষেও হিতকর।

শিশুর মুখপাকে।—শিশুদিগের মুখের ভিতর ঘা হইলে যে আমগাছের কাষ্ঠ সারযুক্ত হইয়াছে তাহা, গেরিমাটি এবং রসাঞ্জন সমানভাগে মিশাইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লাগাইয়া দিলে, আরোগ্য হইয়া থাকে।

অগ্নিদগ্ধ স্থানে।—আমপাতা পোড়াইয়া—কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে প্রলেপ দিলে উপশমিত হইয়া থাকে।

ডায়াবিটিস বা বহুমূত্রে।—আমের কচিপাতা গুঁড়া করিয়া সেবন করাইলে, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্রে উপকার হয়।

ক্রিমিরোগে।—আমের ছাল আধতোলা, জল আধসের, জ্বাল শেষে আধপোয়া—এই কাথ সেবনে ক্রিমিরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

চর্ম্মরোগে।—আম্র ছালের নির্য্যাস প্রস্তুত করিয়া প্রলেপ দিলে, "স্ক্যাবিশ্." নামক চর্ম্মরোগ প্রশমিত হয়।

সর্দ্দিগর্ম্মিতে।—কাঁচা আম পোড়াইয়া খাইলে সর্দ্দিগর্ম্মিতে উপকার হয়। শুধু সর্দ্দিগর্ম্মি নহে, রৌদ্র লাগা এবং পশ্চিম প্রদেশের 'লু'—লাগারও ইহা অপূর্ব্ব ঔষধ।

কাণের ঘায়ে।—আমের গাছের সাদা সাদা চটার নাম "কাণচট্‌কা।"—এই 'কাণচট্‌কা' সরিষার তৈলের সহিত ভাজিয়া শিশুদের কাণের ঘায়ে লাগাইলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ডাক্তারি মত।—ডাক্তারি মতে অতিসার এবং নাসিকা, পাকস্থলী, গর্ভাশয়, অন্ত্র এবং ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হইলে, স্রাব নিবারণের জন্য আম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঁঠাল

কাঁঠালের কাঁচা অবস্থার নাম এঁচোড়। ইহা বায়ুবর্দ্ধক। গুরুপাক, দাহজনক, কফ ও মেদোবর্দ্ধক, কিন্তু বলকারক।

পাকা কাঁঠাল স্নিগ্ধ, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, মাংসবর্দ্ধক, বলকারক, এবং পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণনাশক। কিন্তু কফজনক। কাঁঠালের বীচি মধুর রস বিশিষ্ট, মূত্রনিঃসারক কিন্তু গুরু ও মলরেচক। ইহা একটি পুষ্টিকর খাদ্য।

কাঁঠালের রোগনাশিনী শক্তি।—কাঁঠালের ভূঁতি পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া, একটু চূণের সহিত মিশাইয়া, ফোড়ার উপরে প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। সিদ্ধি খাইয়া নেশা হইলে কাঁঠাল পাতার রস পান করিলে নেশা ছাড়িয়া যায়।

কাঁঠালের অপকারিতা।—কাঁঠাল গুরুপাক বলিয়া অধিক পরিমাণে খাওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। গুল্ম রোগী এবং মন্দাগ্নিযুক্ত রোগীর পক্ষে ইহা ভক্ষণ করা উচিত নহে। কাঁঠাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কলা খাইলে জীর্ণ হইয়া থাকে।

জাম

জাম তিন প্রকার, বড় জাম, ছোট জাম ও গোলাপ জাম। আমাদের দেশের বড় জামই সাধারণতঃ কালো জাম নামে অভিহিত।

জামের গুণ।—বড় জাম—গুরুপাক, বাতজনক ও কফপিত্ত প্রশমক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। ছোট জাম—ধারক, কফপিত্ত, রক্ত দুষ্টি ও দাহ নাশক গুণ বিশিষ্ট। গোলাপ জাম খাইতে রুচিপ্রদ কিন্তু গুরুপাক, এজন্য অজীর্ণ রোগীর পক্ষে বিষের মত।

রোগ নাশিনী শক্তি।—জামের ফল, পাতা, আঁটি এবং জাম গাছের ছালের যে সকল রোগনাশিনী শক্তি আছে, তাহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে;—

রক্তাতিসারে।—(১) জামের ছাল ২ তোলা, জল দেড় পোয়া ও ছাগ দুগ্ধ আধ পোয়া—একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধটুকু অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া একটু চিনি মিশাইয়া পান করিলে প্রবল অতিসার আরোগ্য হয়। (২) জামের কচি পাতা—ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে রক্তাতিসারে উপকার হয়।

বমন।—জাম ও আম পাতার প্রত্যেকটি এক তোলা করিয়া লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া একটু একটু করিয়া পান করিলে পিত্তজনিত বমি আরোগ্য হয়।

শিশুর পেটের পীড়ায়।—জাম ছালের রস ও ছাগী দুগ্ধ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুদের অতিসারাদি সকল প্রকার পেটের পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

ক্ষতশুদ্ধিতে।—জামপাতা পিষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষতশুদ্ধি হইয়া থাকে।

দন্ত রোগে।—দাঁতের মাড়ী হইতে রক্তস্রাব বা দাঁতের ক্ষত

হইলে ও জিহ্বা ফাটিয়া গেলে, জামছাল এবং তুয়ালভা—এক একটি দ্রব্য এক এক তোলা করিয়া লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই ক্বাথে কুলকুচা করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

বহুমূত্রে।—জামের আঁটি গুঁড়া করিয়া দুই আনা মাত্রায় সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ প্রশমিত হয়।

পেঁপে

কাঁচা পেঁপের গুণ আমরা তরকারী প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছি। পাকা পেঁপে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, ইহা সহজপাচ্য ফল। রক্তপিত্ত রোগে এবং অর্শরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

পেঁপের আটা।—পেঁপের আটা প্লীহানাশক। অজীর্ণ, অগ্নি-মান্দ্য এবং অম্লপিত্তের রোগীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী; ইহা ভিন্ন পেঁপের আটা ক্রিমিঘ্ন ও গ্রহণীরোগ নাশক। সেবনের জন্য মাত্রা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে চা'র চামচের এক চামচ। ৭ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কের জন্য অৰ্দ্ধ চামচ। ৩ বা তাহার নিম্নবয়স্কের পক্ষে 'চা'র চামচের ⅙ অংশ। দদ্রুরোগে পেঁপের আটা লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পেপেওটীন—ইহা পেঁপের আটার অন্যতম বীর্য্যবান উপাদান, পেঁপের আটা হইতেই ইহা প্রস্তুত হয়। ডাক্তারেরা ২ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় ইহা ব্যবস্থা করেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—১ গ্রেণ পেপেওটিন এক পাইট অর্থাৎ দেড় পোয়া দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে। এখনকার দিনে অজীর্ণপ্রবণ বাঙ্গালীদিগকে প্রত্যহ পেঁপের আটা দুই বেলা খাইতে পরামর্শ প্রদান করি।

কলা

পুষ্টিজনক, রুচিকারক ও মাংসবর্দ্ধক। অধিকন্তু চর্ম্মরোগ ও রক্তপিত্ত রোগে ইহা উপকারী, সারক এবং বলকারক। কোষ্ঠকাঠিন্যে কলা খাইলে সহজে দাস্ত পরিষ্কার হয়।

মাণিক্য, মর্ত্তমান, অমৃত ও চম্পক প্রভৃতি কদলীর নানাপ্রকার ভেদ আছে। সর্দ্দি কাসি হইলে কলা সেবন করা উচিত নহে। কলা সহজলভ্য অতি উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া দেবতার পূজায় ইহার প্রচলন সমধিক।

সোমরোগে।—পাকা কলার সহিত কাঁচা আমলকীর রস ও কিঞ্চিৎ চিনি ও অল্প মধু মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

নারিকেল

কাঁচা এবং পাকা নারিকেলের গুণ।—কোমল নারিকেল পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগ নাশক। পরিণত নারিকেল—গুরু, হৃদ্য এবং বল ও মাংসপ্রদ।

ডাবের জল।—ডাবের জল অগ্নিদীপক, পিপাসানাশক, অম্ল, হিক্কা ও বায়ুনাশক।

ডাবের শাঁস।—মূত্রবর্দ্ধক ও অম্লনাশক।

পরিণাম শূলে।—একটি সুপক্ক এবং সজল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধবলবণচূর্ণ পূর্ণকরতঃ মৃত্তিকার লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে এবং তাহার পর তাহার ভিতরস্থ কৃষ্ণবর্ণ শস্য দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া একটু পিঁপুলের গুড়া মিশাইয়া সেবন করিলে, পরিণাম শূল হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

বেল

বেলের কাঁচা এবং পাকা উভয়ই উপকারী। কাঁচা বেল ধারক এবং পাকা বেল সারক। কাঁচা বেল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া উহার খোলা, বীজ ও আঠা বাদ দিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। যাঁহারা অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিসপেপ্‌সিয়া রোগে পীড়িত তাঁহাদের পক্ষে ইহা নিত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

যাঁহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাঁহারা পাকা বেল খাইলে উপকার পাইবেন। অর্শরোগীর পক্ষে ইহা প্রত্যহ খাওয়া উচিত।

কয়েদ বেল।—কয়েদবেলের পক্কাবস্থাতেই ব্যবহার কর্ত্তব্য। ইহা ধারক, কণ্ঠশোধক, পিত্তনাশক, হিক্কা নিবারক এবং বায়ু নাশক কিন্তু দুষ্পাচ্য, এজন্য ইহা অধিক খাওয়া উচিত নহে।

কুল।—নারিকেল কুল, বনকুল, সেয়াকুল প্রভৃতি নানাপ্রকার কুল হইয়া থাকে। সকল প্রকার কুলই পিপাসানাশক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং রক্তদোষ নাশক।

আনারস।—ক্রিমিনাশক, সারক, বায়ুনাশক, রুচিজনক, শ্লেষ্মকারক, তৃপ্তিপ্রদ।

পেয়ারা।—ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জর, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম, ও শোথ বিনাশক ও বলকারক। কিন্তু ইহার বীজ ফেলিয়া খাওয়াই উচিত, নতুবা গুরুপাক হইয়া থাকে।

কাঁকুড় বা ফুটি।—কাঁকুড় পিত্তঘ্ন, কফনাশক ও ধারক। ফুটি পিত্তবর্দ্ধক।

তরমুজ।—অপক্ব অবস্থায় অধিক খাইতে নাই। কারণ ইহা ধারক এবং গুরু। পক্ব তরমুজ বায়ুনাশক কিন্তু পিত্তকারক।

খরমুজ।—ইহা মূত্রকারক, বায়ুনাশক, বলকারক ও কোষ্ঠশোধক।

শশা।—কচিশশা পিপাসা, ক্লান্তি, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক। পাকা শশা পিত্তবর্দ্ধক কিন্তু কফ ও বায়ুনাশক। শশার বীজ মূত্রকারক, পিত্ত ও রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতানাশক।

আতা।—ইহা তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, রক্তবর্দ্ধক, কিন্তু শ্লেষ্মজনক। বাতপিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, তৃষ্ণা ও বমন রোগ নিবারণের জন্য ইহা খাইলে উপকার হইয়া থাকে।

তাল।—পাকা তাল পিত্তবর্দ্ধক, কফজনক, কিন্তু রক্তবর্দ্ধক। ইহা দুষ্পাচ্য, তন্দ্রাজনক এবং মূত্রজনক।

তালশাঁস।—কফবর্দ্ধক, কিন্তু বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং সারক।

করম্‌চা।—ইহা অপক্ক অবস্থায় পিপাসা নাশক কিন্তু গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও কফজনক। পক্ক অবস্থায়—ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

লেবু।—লেবুর মধ্যে পাতিলেবু উৎকৃষ্ট। পাতি এবং কাগজীলেবু ক্রমি ও অম্লনাশক এবং উদরব্যথা নিবারক। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং বাতরোগে ইহা অমৃততুল্য। বাতাবীলেবু যকৃতের পক্ষে পরমোপকারী। কমলালেবু অতিশয় বলকারক। একছটাক কমলালেবুর রস একছটাক খাটিদুধের সমান। প্রত্যেক লেবুতেই ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যহ শিশুদিগকে পাতিলেবুর রস সেবন করাইলে উপকার দর্শে এবং বয়স্ক ব্যক্তিরাও ইহা হইতে যথেষ্ট উপকার পাইবেন।

বাদাম।—সর্ব্ববিধ বাদামই পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু সুলভতা, সহজপ্রাপ্যতা এবং পুষ্টিকারিতাগুণে চীনাবাদামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ছানা ও মাখন জাতীয় পদার্থ চীনাবাদামে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কাটখোলায় ভাজিয়া, চিনির সহিত পাক করিলে চীনাবাদাম দিয়া একটি উৎকৃষ্ট জলখাবার প্রস্তুত হয়। ইহা 'নকুল দানা' নামে খ্যাত। মধ্যে মধ্যে ঘরে প্রস্তুত করিয়া জলখাবার রূপে ব্যবহার করিলে, অল্প খরচে উৎকৃষ্ট খাওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, খেজুর, পেস্তা প্রভৃতির পুষ্টিকারিতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে সকলেই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। এ সকল ফল কিছু মহার্ঘ এবং সাধারণ বাঙ্গালীর সহিত ইহাদের সম্পর্ক খুবই কম।

ইক্ষু।—ইক্ষু ফল নহে; কিন্তু এ স্থলে ইহার গুণাগুণের কথা উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না। কচি ইক্ষু—কফকারক এবং মেদোবর্দ্ধক। মাঝারি ইক্ষু—বাত ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ ইক্ষু—বলবর্দ্ধক, ক্ষত ও রক্তপিত্তনাশক। ইক্ষু দন্তে চর্ব্বণ করিয়া খাওয়াই উচিত—বিশেষতঃ, শিশু ও বালক বালিকাদিগকে সেই ভাবে খাইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ, তাহাতে দাঁত শক্ত হয়। অধিকন্তু দন্ত-চর্ব্বিত ইক্ষুরসের গুণ সমধিক। দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস চিনির অপেক্ষা বীর্য্যবান। যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস গুরুপাক এবং বাসি ইক্ষুরস সর্ব্বথা অসেব্য।

নবম অধ্যায়

খাদ্যপ্রাণ (ভাইটামিন্)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের খাদ্যবস্তুর মধ্যে কতিপয় রাসায়নিক উপাদান অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে ; কোন কোনটিতে হয়ত' সবগুলিই আছে, আবার কোন কোনটিতে হয়ত দুই একটি আছে। সে সকল উপাদান আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, দেহের তাপজনন এবং দেহ-গঠনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয়। অতএব, যদি কৃত্রিম উপায়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত রাসায়নিক উপাদান সমূহ যথা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা দেহের খাদ্যাভাব মিটিতে পারে এবং খাদ্যগ্রহণের উদ্দেশ্যও সাধিত হইতে পারে। এক কথায়, উহাই হইবে আদর্শ খাদ্য ; কিন্তু তাহা হয় না।

বৈজ্ঞানিক দেখিলেন যে, এক মাত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত খাদ্য দ্বারা জীবজন্তুকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় না। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, স্বভাবজাত খাদ্যবস্তুর মধ্যে পূর্ব্বপরিচিত রাসায়নিক উপাদানগুলি ব্যতীত এমন কিছু আছে, যাহা দেহের বৃদ্ধি ও রক্ষণ কার্য্যে সহায়তা করে এবং দেহে রোগপ্রতিষেধকতা শক্তি দেয়। উহা কি ? বৈজ্ঞানিকেরা উহার নাম দিয়াছেন—ভাইটামিন্। উহাই খাদ্য-বস্তুর প্রাণ—বীর্য্য,—বা এক কথায়, খাদ্যপ্রাণ।

এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে, খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত প্রোটীন্ ও অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান নিস্তেজ বা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। তবে, খাদ্যপ্রাণের স্বরূপ কি, তাহা বৈজ্ঞানিক আজিও নির্ণয় করিতে পারেন নাই, উহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন মাত্র।

বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ খাদ্যপ্রাণ সর্ব্বত্র সমধর্ম্মা নয়, অর্থাৎ মানব ও জীবজন্তুর দেহে উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। এবং খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব ঐ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। এজন্য বৈজ্ঞানিকেরা গুণানুসারে ভাইটামিনের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ছয়শ্রেণীর ভাইটামিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবশ্য দেশভেদে, জাতিভেদে অনন্তপ্রকার স্বভাবজাত মানবখাদ্য রহিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটির বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা কোনদিন হইবে কিনা কে জানে! অতএব, ভাইটামিন সম্বন্ধে শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে মানুষের এখনও বিলম্ব আছে। তবে, আবিষ্কৃত ভাইটামিন্‌গুলির আলোচনা করিয়া, বৈজ্ঞানিক কয়েকটি সাধারণ তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন। যথা,—

(১) কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশ খাদ্যপ্রাণই উদ্ভিদ্‌জগতের।

(২) খাদ্যবস্তুর যে অংশ সূর্য্যের আলোক পায়, সেই অংশই অধিক বীর্য্যবান্।

[এই জন্য ফল, শাকসজী, শস্য প্রভৃতির খোসা এবং খোসার সন্নিহিত অংশগুলি অধিক বীর্য্যশালী। পশুমাংসের মধ্যে মস্তক, মেরুদণ্ড ও বক্ষঃস্থল অধিক বীর্য্যবান্ এবং পশুগণ উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করে বলিয়া ইহাদের যকৃত (মেটে) অতিশয় বীর্য্যশালী। যে সকল ক্ষুদ্র মৎস্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ খায়, তাহারাও খাদ্য-প্রাণসম্পন্ন। কড্ মৎস্য ছোট মাছ খাইয়া থাকে, এজন্য কড্ মৎস্য বিপুল খাদ্যপ্রাণ সম্পন্ন।]

(৩) প্রাণীজই হউক, অথবা উদ্ভিজ্জই হউক,—টাট্‌কা বা স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যবস্তুর বীর্য্য বিশুদ্ধ বা পূর্ণ থাকে।

(৪) খাদ্যপ্রাণই খাদ্যের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানকে শরীরের যথাযথ স্থানে স্থাপন করে।

(৫) খাদ্যপ্রাণই দেহকে রোগপ্রতিষেধক শক্তি দেয়।

(৬) অগ্নির উত্তাপে খাদ্যবীর্য্যের হ্রাস হয় বা নাশ হয়।

(৭) সংরক্ষণ (preservation) দ্বারাও উহা ধ্বংস হয়।

(৮) একই খাদ্যবস্তুতে একাধিক প্রকার খাদ্যবীর্য্য থাকিতে পারে।

(৯) খাদ্যবীর্য্য-বিশেষের অভাবে দেহে রোগবিশেষ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

অতএব, আমাদের সর্ব্বাগ্রেই লক্ষ্য করা উচিত যে, আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি স্বাভাবিক বিশুদ্ধ অবস্থায়, অর্থাৎ, টাট্‌কা অবস্থায় রন্ধন না করিয়া ভক্ষণ করিতে পারি। কারণ, তাহা হইলেই আমরা খাদ্যপ্রাণের উপকারিতা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে পারিব। সাধারণতঃ ফল আমরা টাট্‌কা অবস্থায় খাইয়া থাকি। মূলের মধ্যে শাঁকালু ও মূলা—কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলে। কিন্তু বাঙ্গালী শাকসব্জী আদৌ কাঁচা খায় না। ইংরাজেরা যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা শাকসব্জী খাইয়া থাকেন। শাকসব্জীর মধ্যে লেটুশ, পুদিনা, চুকাপালঙ্, মূলার শাক, কচি ফুলকপির ফুল, বাঁধা কপির কচি পাতা, বিলাতি বেগুণ, পিঁয়াজ প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলে।

ঐ সকল সব্জী কিন্তু গরমজলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া খাওয়া উচিত। তাহাতে খাদ্যবীর্য্যের হ্রাস হয় না, অথচ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত হয়। যাঁহারা একেবারে কাঁচা খাইতে নারাজ, তাঁহারা নামমাত্র সিদ্ধ করিয়া খাইতে পারেন। মোট কথা, আমাদের বাঙ্গালীর সংসারে যে ভাবে সুসিদ্ধ তরকারী প্রস্তুত হয়, তাহাতে আমরা শাকসব্জীর সম্যক্ ফল লাভে বঞ্চিত। অথচ নানাকারণে ঐরূপ তরকারী বর্জ্জন করিবার উপায় নাই এবং বোধ হয় উচিতও নয়। এমতাবস্থায় সুসিদ্ধ তরকারীর পরিমাণ কিছু কমাইয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে নামমাত্র সিদ্ধ

অথবা গরমজলে ধৌত টাট্‌কা শাকসব্জী প্রত্যহ কিছু খাওয়া উচিত। জলখাবার হিসাবে, ভিজামুগ, অঙ্কুরিত ছোলা ও গুড় অতি উত্তম খাদ্য।

এ স্থলে, আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। আমাদের বাঙ্গালীর সংসারে যে ভাবে তরকারীর খোসা ছাড়ানো হয়, তাহাতে খাদ্যবীর্য্যের অনেকটা অপচয় ঘটে। আলুর খোসা ছাড়ানো উচিত নয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি নিতান্তই ছাড়াইতে হয়, তাহা হইলে সিদ্ধ করিবার পর ছাড়ানোই ভাল, তাহাতে সারাংশ বজায় থাকে। খাদ্যবীর্য্য সাধারণতঃ খোসার সন্নিহিত স্থানে থাকায়, অসতর্ক ভাবে গভীর রূপে খোসা ছাড়াইলে সারাংশের অযথা অপব্যয় হয়। নিতান্ত যতটুকু বাদ না দিলে চলেনা, ততটুকুই দেওয়া উচিত, অর্থাৎ খোসার কঠিন অংশ, শিরা প্রভৃতি সাবধানে বাদ দিলেই যথেষ্ট।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, সংরক্ষণ দ্বারা খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। অতএব সর্ব্ববিধ সংরক্ষিত খাদ্য, ফল, টিনের বাসি বিস্কুট প্রভৃতি বর্জ্জন করাই উচিত। খাদ্য হিসাবে ইহাদের মূল্য নগণ্য, অথচ অপব্যয়ের মাত্রা বাড়ে। বাজারে প্রচলিত নানাপ্রকার ফুড্ সম্বন্ধে একথা আরও অধিক পরিমাণে প্রযোজ্য। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া খাদ্যহিসাবে মূল্যহীন এবং নগণ্য এই সকল অখাদ্য শিশুখাদ্য রূপে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া, অনেকে একদিকে যেমন অপব্যয় করিতেছেন, তেমনি শিশুর স্বাস্থ্যনাশের কারণ হইতেছেন। এ সমস্ত খাদ্যের কুফল সব সময় সদ্যঃ দেখা যায় না বটে, কিন্তু বিলম্বেই হউক, অথবা অবিলম্বেই হউক ইহারা যে কুফলপ্রসূ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহাদের কোন কোনটিতে পুষ্টিকর উপাদান থাকিলেও, ঐ গুলির কোনটিই এখানে একেবারে টাট্‌কা অবস্থায় পাইবার উপায় নাই। বিদেশ হইতে ঐ সকল দ্রব্য ভারতবর্ষের বাজারে উপস্থাপিত করিতে

যত সময় লাগে, তত সময় পর্য্যন্ত উহারা কখনই টাট্‌কা থাকিতে পারে না, এবং খাদ্য হিসাবে উহাদের মূল্যের অনেক হ্রাস হয়। সুতরাং কারখানার স্থানীয় বিশ্লেষণ (analysis) দেখিয়া মোহিত না হওয়াই উচিত। মনে রাখিতে হইবে, শুধু রাসায়নিক উপাদানই যথেষ্ট নহে এবং ঐ সকল খাদ্য —খাদ্যপ্রাণহীন।

অতঃপর, আমরা আবিষ্কৃত খাদ্যপ্রাণগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। কোন্ কোন্ খাদ্যে কোন্‌টি বিদ্যমান এবং কোনটির অভাবে কি রোগ জন্মিতে পারে তাহাও দেখান যাইতেছে। সাধারণতঃ খাদ্যপ্রাণগুলি কোথাও বিপুল বলসম্পন্ন, কোথাও মধ্যমবল এবং কোথাও সাধারণ ভাবে আছে।

খাদ্যপ্রাণ 'ক'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) বৃহৎ জাতীয় মাছে, মাংসে, ডিমের সারাংশে (পক্ষী ডিম্বে অতিশয় বেশী পরিমাণে)।

(২) যাবতীয় দুধে, দুধের সরে এবং ছানায় অতিশয় বেশী পরিমাণে। মাখন তোলা দুধে সামান্য পরিমাণে।

(৩) টাট্‌কা শাকসব্জী, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিলাতি বেগুণ, আলু প্রভৃতিতে। টাট্‌কা পালং শাকে অতিশয় বেশী পরিমাণে।

(৪) যাবতীয় দালে এবং অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগে।

(৫) মৎস্য-তৈলে। কড্‌লিভার তৈলে অতিশয় বেশী পরিমাণে।

(৬) ফলের মধ্যে আনারসে অতিশয় বেশী পরিমাণে। পেঁপে আপেল. বাদাম, চীনাবাদাম, নারিকেল, কাঁঠাল ও বেলে আছে।

মন্তব্য—শিশুর অকালমৃত্যু, উদরাময়, যকৃতের পীড়া প্রভৃতির অন্যতম প্রধান কারণ—খাদ্যদ্রব্যে 'ক' খাদ্যপ্রাণের অভাব।

যথোপযুক্ত মাতৃস্তন্য এবং গাভীদুগ্ধের পরিবর্ত্তে যাহাদিগকে অসার পেটেণ্ট ফুড্ খাওয়ানো হয়, সেই সকল শিশু উপরোক্ত রোগসমূহে ভুগিয়া থাকে। এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে শারীরিক শীর্ণতা, বুদ্ধিহীনতা, রক্তাল্পতা এবং ক্ষুধা ও দৃষ্টিশক্তির হ্রস্বতা জন্মে। ইহার অভাবে বয়স্ক ব্যক্তিরও রোগ প্রতিরোধের শক্তি কমিয়া যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'খ'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) ডিম্বে।—(মৎস্য ডিম্বে বেশী।) মাংসে অল্প পরিমাণে।

(২) যাবতীয় দুধে, ঘোলে এবং ছানায়। কিন্তু মাখনে নাম মাত্র।

(৩) ঢেঁকিছাঁটা চাল, চিঁড়া, দাল, গম (ধব্ধবে শাদা ময়দা অপেক্ষা লাল যাঁতা ভাঙ্গা আটায় বেশী), সাগু, বার্লী, রাই, ভুট্টা, জই প্রভৃতি শস্যে।

(৪) শাকসব্জীতে।—পালং শাকে এবং ঢেঁড়শে অতিশয় বেশী পরিমাণে। টাট্কা মটর শুঁটি, অল্প সিদ্ধ আলু, পিঁয়াজ, লেটুশ্ শাক, ফুলকপি, বিলাতী বেগুন এবং শালগমে কিছু বেশী মাত্রায়।

(৫) নানাবিধ ফলে।—নারিকেল, বাদাম, আখরোট, পেঁপে আপেল, আঙ্গুর, কাগজি ও পাতিলেবু, আনারস, কমলালেবু এবং বাতাবীলেবুতে কিছু বেশী মাত্রায়। আম, জাম, কদলী ও শশাতেও আছে।

মন্তব্য।—মানবদেহের অন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এই জাতীয় খাদ্যপ্রাণ কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে সবল রাখে। আমরা যে ভাবে ভাত খাইয়া থাকি, তাহাতে চাউলের 'খ' খাদ্যপ্রাণ নর্দ্দমার আশ্রয় লাভ করে। অর্থাৎ, ফেন গালার সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এই

'খ' খাদ্য প্রাণের অভাবে পিত্তের বিকার, ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাক শক্তি-হীনতা, উদ্যমহীনতা ও নানাবিধ স্নায়ুবিকার উপস্থিত হয়। ইহার অভাবে প্রধানতঃ বেরি বেরি রোগ জন্মিয়া থাকে।

খাদ্যপ্রাণ 'গ'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) কাঁচা ফলমূলে।—টাট্‌কা পাতি লেবুর রস, কমলালেবুর রস, আনারস ও টেঁপারীতে অতিশয় বেশী পরিমাণে। কলা, আপেল, আঙ্গুর, পিচ্‌ফল এবং পাতিলেবুতে কিছু বেশী মাত্রায়। আম, জাম, কাঁঠাল, বেল এবং তালশাঁসেও বর্ত্তমান।

(২) তাজা শাকসব্জিতে।—বিলাতীবেগুন, বাঁধাকপি, লেটুশ শাক, টাট্‌কা মটরশুঁটি, পালং শাক, মুলার খোসা এবং শালগমে অতিশয় বেশী পরিমাণে। কাঁচকলা, আলুর খোসা, অল্পসিদ্ধ আলু, পিঁয়াজ এবং অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগে কিছু বেশী মাত্রায়।

(৩) দুধেও আছে, কিন্তু বেশী নয়।

মন্তব্য—ইহার অভাবে 'স্কার্ভি' নামক রোগ জন্মে, এই রোগে শিশুদের অস্থি নরম হইয়া যায় এবং দাঁতের মাড়ী নরম হয় ও দাঁত খারাপ হয়। বয়স্কদিগকেও এই রোগ ধীরে ধীরে আক্রমণ করে। এজন্য টাট্‌কা শাকসব্জি ও শস্য সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। শুষ্ক শাকসব্জি ও শস্যাদিতে এবং পনের মিনিটের অধিককাল সিদ্ধ তরকারিতে ও দুইবার জ্বাল দেওয়া দুধে 'গ' খাদ্যপ্রাণ সমূলে বিনষ্ট হয়।

খাদ্যপ্রাণ 'ঘ'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) মাছের ও পক্ষীর ডিম্বে। কড্‌লিভার তৈলে।

(২) কাঁচা দুধে বেশী পরিমাণে। একবল্‌কা দুধে তাহাপেক্ষা কম। বেশী জ্বাল দেওয়া দুধে থাকে না। স্তনদুধে বেশী আছে। যে সকল গাভী বা ছাগল যথেষ্ট পরিমাণে তাজা ঘাস খাইতে পায় না অথবা সম্বৎসর একস্থানে আবদ্ধ থাকে, তাহাদের দুধে 'ঘ' খাদ্যপ্রাণ থাকে না।

মন্তব্য—দেহের অস্থির উপরেই এই খাদ্যপ্রাণ ক্রিয়াশীল এবং ইহার অভাবে শিশুদিগের রিকেট্‌স্ রোগ হয়'—দাঁত সহজে উঠেনা, এবং অস্থি বক্র হইয়া যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'ঙ'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) প্রায় প্রত্যেক প্রাণীদেহে, বিশেষতঃ সদ্যঃপ্রসূত প্রাণী-দেহে।

(২) গমে এবং শাকসব্জী ও মটরে।

মন্তব্য—এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটে, অথবা গর্ভস্থ ভ্রূণ আশু বিনষ্ট হয়। সদ্যঃজাত ছাগশিশুর মাংস খাইলে অথবা গম হইতে প্রস্তুত তৈল খাইলে, এই দোষ দূর হয়, শুনা যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'চ'

এই খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। রোগবিশেষে খাদ্যবিশেষের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন যক্ষ্মারোগে কড্‌লিভার তৈল রোগীকে রোগের সহিত যুঝিবার শক্তি দান করে, এই যে যুঝিবার শক্তিদান—ইহা এক একজাতীয় খাদ্যপ্রাণের ধর্ম্ম। বৈজ্ঞানিকেরা উহাকেই খাদ্যপ্রাণ 'চ' আখ্যা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা শেষ হয় নাই।

দশম অধ্যায়

আহারের পরিমাণ

আহারের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে জানা উচিত যে, অমিত ভোজন অনন্ত দোষের আকর।

খাদ্যবস্তুর উপাদান সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করিয়া, সংক্ষেপে দেখাইয়াছি, দেহের পক্ষে কোন্ কোন্ জাতীয় খাদ্য হিতকর। কিন্তু যিনি স্বাস্থ্যসুখ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন, তাঁহাকে শুধু হিতভোজী হইলেই চলিবে না, মিতভোজীও হইতে হইবে। অধিকাংশ ব্যাধিরই মূল কারণ—হয় অহিত ভোজন, নয় অতি ভোজন।

বয়স ও অবস্থাভেদে আহারের একটা মাত্রা আছে, যে মাত্রাপেক্ষা বেশী বা কম আহার করিলে স্বাস্থ্য বজায় থাকে না। এ মাত্রা কতটা হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অনেকেরই মোটামুটি একটা ব্যক্তিগত ধারণা আছে। যদি অল্প কথায় মিত ভোজনের একটা সংজ্ঞা দিতে হয়, তাহা হইলে বলিব,—যতটা আহার করিলে মনে হয় সম্পূর্ণরূপে ক্ষুধা নিবারিত হইয়াছে, অথচ ইচ্ছা করিলে আরও কিছু খাওয়া যায়, মাত্র ততটা আহার করার নামই মিতভোজন। তদতিরিক্ত বা তদপেক্ষা কম খাওয়া উচিত নহে।

প্রথমেই দেখা যাক, গুরু ভোজনে কি কি কুফল জন্মিতে পারে। খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিয়া, আমরা তাহার সারাংশ গ্রহণ করি এবং অসার অংশ মলাদিরূপে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেই। এই গ্রহণ ও বর্জ্জন কার্য্যে কতকটা শক্তির ব্যয় হয়। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শারীর যন্ত্রগুলিকে

অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, কাজেই শক্তি অত্যধিক ব্যয়িত হয়। এমতাবস্থায় মানুষের মানসিক শ্রম করিবার শক্তি হ্রাস পায়। কারণ দেহের কাজে অনেকটা শক্তি ক্ষয় হওয়াতে,উহা মানসিক বিকাশে সহায়তা করিতে পারে না। গোজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা এক কালে অধিক পরিমাণে আহার করিয়া লয়, পরে দিনের অধিকাংশ সময় উক্ত আহার্য্য রোমন্থন করে। মানুষ রোমন্থনকারী জীব নহে, এবং তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনেকখানি মানসিক শক্তির দরকার হয়। গুরু ভোজন এই মানসিক শক্তি বিকাশের অন্তরায়।

দ্বিতীয়তঃ, গুরুভোজনে পরিপাকযন্ত্রাদির অত্যধিক পরিশ্রম হয় বলিয়া, উহারা ক্রমশঃ বিকল এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যন্ত্রমাত্রেরই কার্য্যক্ষমতার একটা সীমা আছে, তদধিক কার্য্য করিতে বাধ্য করিলে উহারা শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পরিপাক যন্ত্রাদি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। এই জন্যই অমিত ভোজন অকালমৃত্যুর একটি কারণ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন, "যার যতদিন অন্নজল মাপা আছে, তার ততদিন আয়ু।" এ কথার অর্থ হইতেছে এই,—ভগবান যেন প্রত্যেক জীব-সৃষ্টির সময় তাহার আহার্য্যের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আহার্য্যটুকু সে যখন শেষ করিয়া ফেলে, তখন তাহাকে চিরবিদায় লইতে হয়। আমরা এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা নিম্নে দিতেছি।

একদিন নারদ ঋষি পৃথিবী-পর্য্যটন কালে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পথের ধারে দুই জন অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র লোক বসিয়া আছে। ঋষি সম্মুখীন হইলে, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া উভয়েই কহিল, "ঠাকুর! আর ত পারিনা, খেতে না পেয়ে যে প্রাণ যায়।—এবারে গোলোকে গিয়ে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করবেন যে,

এভাবে আমাদের আর কতদিন চল্‌বে। হয় তিনি আমাদের প্রাণান্ত করুন, না হয় আহারের একটা সুব্যবস্থা করে দিন।" এই ভাবে তাহারা ঋষির কাছে নানারূপ কাতোরোক্তি করিতে লাগিল। তাদের ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে নারদ আশ্বাস দিলেন যে, তিনি নারায়ণের কাছে তাহাদের আর্‌জিটুকু পেশ করিবেন।

যথাসময়ে নারদ তাদের অবস্থার কথা নারায়ণের কাছে বিশেষ ভাবে জানাইয়া কহিলেন,—"প্রভু! এদের একটা বিহিত না কর্‌লে আর চলে না।"

অন্তর্য্যামী সস্নেহে কহিলেন, "নারদ, তাদের কথা আমি জানি। তাদের যা প্রাপ্য তাই তারা পেয়েছে। তার বেশী পাবে কি করে?"

নারদ বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন,—"সে হবেনা, দয়াময়! কিছু তাদের দিতেই হবে। আমি অনেক আশ্বাস দিয়ে এসেছি। আহা, বেচারীরা কিছুকাল খেয়ে দেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকুক!"

নারদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নারায়ণ বলিলেন, "আচ্ছা বৎস, তোমার কথায় এবার তাদের আমি কিছু দিচ্চি। কিন্তু সাবধান, পুনরায় চাহিওনা, ত্রিসংসারের খাদ্য আমায় যোগাইতে হয়, আমি শুধু তাদেরই নহি। যাও বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ-বেশে গিয়ে, তাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ মণ করে আহার্য্য দিয়ে এস।"

নারদ পুলকভরে কহিলেন, "যথেষ্ট, প্রভু। এতেই তাদের বহুদিন সুখে কেটে যাবে।" নারায়ণের আদেশ মত নারদ ব্রাহ্মণ-বেশে তাদের উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্য দিয়া আসিলেন।

বহুকাল পরে, নারদ ঘটনাক্রমে সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুই ব্যক্তির একজন বহুদিন পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে, কিন্তু অপর জন অপ্রত্যাশিতরূপে জীবিত! বিস্মিত নারদ গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, নারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু! সেই

দুই ব্যক্তির একজন বহুপূর্ব্বেই মরিয়াছে, কিন্তু অপর ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে কিরূপে? তাহার নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ত এতদিনে নিঃশেষ হইয়া যাইবার কথা।"

নারায়ণ সস্নেহে কহিলেন—"বৎস! যে ব্যক্তি মারা গিয়াছে, সে তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য অতিভোজনে আশু নিঃশেষ করিয়াছে। কিন্তু অপর ব্যক্তি যে জীবিত আছে, সে আমাকে ভারি বিপদে ফেলিয়াছে! ঐ ব্যক্তি নিজের প্রাণ-ধারণের উপযোগী আহার মাত্র গ্রহণ করে, কাজেই তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এখনও শেষ হয় নাই। অধিকন্তু, সেই প্রথম যেদিন তুমি তাহাকে খাদ্য দিয়া আসিয়াছিলে, সেই দিন হইতে প্রত্যহ নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যাংশ অপরকে বিলাইয়া দেয়। কাজেই, আমাকেও প্রত্যহ আহার যোগাইতে হইতেছে।"

পুলকিত নারদ হর্ষভরে কহিলেন, "ধন্য ভগবান্! ধন্য মানব!"

বলা বাহুল্য, রোগপ্রপীড়িত দুর্ব্বিষহ দীর্ঘজীবন কেহই চায় না। মানুষ দীর্ঘ জীবন চায় সত্য, কিন্তু তৎসহ চায়—আরোগ্য, পুষ্টি ও তুষ্টি। অমিতভোজন এই তিনটি কাম্যবস্তু লাভেই ব্যাঘাত জন্মায়। অমিত-ভোজনের ফলে খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ যথাযথ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়াই অন্ত্রমধ্যে স্থান লাভ করে এবং তথায় দূষিত পদার্থের সৃষ্টি করে। ঐ দূষিত পদার্থের কতকাংশ রক্তে শোষিত হইয়া রক্তকে কলুষিত করে এবং নানাবিধ রোগের মূলীভূত কারণ হয়। কাজেই খুব বেশী খাইয়া যাঁহারা বেশী পুষ্টির আশা করেন, তাঁহারা ফলতঃ লাভ করেন রোগ, শক্তিহীনতা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য।

সাধারণতঃ যৌবনে অমিতভোজনের ফলেই প্রৌঢ়াবস্থায় বা বার্দ্ধক্যে বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। বাতরোগ অধিক ভোজনের ফল-সম্ভূত। অজীর্ণও অতিভোজনের অনুচর।

উপরোক্ত তিনটি রোগই বাঙ্গালাদেশে কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শ্রমবিমুখতাও ঐ সকল রোগের অন্যতম কারণ।

এ স্থলে একটি সামাজিক ব্যাধির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে বা ভোজে খাদ্যদ্রব্যের বিপুল সমারোহ করা একটা ব্যাধিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সেই সরল, অনাড়ম্বর, বাহুল্য-বর্জ্জিত অথচ প্রকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যদ্রব্যের সমাবেশ আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তৎপরিবর্ত্তে অনাবশ্যক বাহুল্য দোষে দুষিত, অপব্যয়ের কতকগুলি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। ইহা মার্জ্জিত রুচির লক্ষণ নহে, রুচি-বিকার। ইহাতে দাতার অহঙ্কার ও আত্মাভিমান প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এক খুব ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপরে ঠিক আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন কি না সন্দেহ, কারণ অনেককেই এরূপ আয়োজন দায়ে ঠেকিয়া, মানের দায়ে, অপরের অনুকরণে করিতে হয়। বাঙ্গালীর ভোজের আয়োজন দেখিলে স্বতঃই মনে হইবে, বাঙ্গালী ভদ্রলোক খাইবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খায় না।

আজকাল অনেক বাঙ্গালী ছাত্র ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের ধারণা যে ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে উপযুক্তরূপে গঠিত করিতে হইলে, খুব অধিক পরিমাণে খাওয়া দরকার। এ ধারণা ভ্রমাত্মক। সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্য যথাপরিমাণে খাইলেই যথেষ্ট। পশ্চিমা পালোয়ানেরা ঐ ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিপুল পরিমাণে আহার করে। ফলে প্রায়ই তাহাদের উদর স্ফীত হয়, অর্থাৎ ভুঁড়ি হয়। অপিচ, অতি ভোজনের কুফল শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, ইহাদের দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শরীর শুধু সবল হইলেই চলিবে না, দ্রুতকার্য্যতৎপর হওয়া চাই। ইউরোপীয় ও

জাপানী পালোয়ানদের মধ্যে লম্বোদর দেখা যায় না, কারণ তাহারা হিতকর দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় ভোজন করে। মাত্রা সম্বন্ধে গোড়া হইতেই তাহারা যথোচিত শিক্ষা পাইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, এমন কতকগুলি ব্যায়াম-ক্রীড়া এ দেশে আমদানি হইয়াছে, যাহা শীতপ্রধান দেশের উপযোগী হইলেও, আদৌ এ দেশবাসীর ধাতুর উপযোগী নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ফুট্‌বল খেলায় অত্যধিক শারীরিক অপচয় ঘটে। অথচ, বাঙ্গালীর ছেলে ফুটবল খেলিয়া শাকান্নাদি যাহা গ্রহণ করে, তাহা ঐ অপচয় নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফলে উহাদের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গেই ফুটবল খেলার প্রচলন অধিক। শুনা যায়, ফুট্‌বল খেলার ফলেই সেখানকার অনেক ছাত্রের মধ্যে যক্ষ্মারোগ দেখা দেয়। ফুটবল খেলার চেয়ে কপাটি খেলা লক্ষ গুণে শ্রেয়।

শিশুদিগের খাদ্যের মাত্রা সম্বন্ধে আমাদের পুরমহিলারা যথেষ্ট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রথমতঃ যে সকল শিশুর কথা ফুটে নাই, তাহাদের কথা ধরা যাক। শিশু ক্ষুধা পাইলে কাঁদে সত্য, কিন্তু, জঠর-জ্বালা ব্যতিরেকে অন্য কারণেও যে শিশু কাঁদিতে পারে, সে কথা জননীরা প্রায় ভুলিয়া যান। শিশু কাঁদিলেই তাহার মুখে স্তন্যদান করা হয়। এ বিষয়ে দিদিমা, পিসীমা, ঠাকুরমারাই বেশী অপরাধী। হয়ত সে সময়ে বাস্তবিকই শিশুর ক্ষুধা পায় নাই, পূর্ব্বভুক্ত দুধ জীর্ণ না হওয়াতে তাহার পেট কামড়াইতেছে। কাজেই সেক্ষেত্রে স্তন্য অমৃতের কাজ না করিয়া গরলেরই কাজ করে। শিশু ঠিক ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে, কি তাহার পেট কামড়াইতেছে, বা কাণ কট্ কট্ করিতেছে, সেটুকু বুঝিয়া তাহাকে আহার দেওয়া উচিত। নচেৎ, অজীর্ণ, উদরাময়, দুধ-তোলা প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা। ছোট ছোট শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া খাওয়ানো কোন ক্রমেই উচিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যতটা আহার করিলে ক্ষুন্নিবারণ হয়, অথচ পাকস্থলীতে কিছু স্থান খালি থাকে, তাহাই আহারের যথার্থ পরিমাণ। অতএব, আহারের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন একটা বাঁধাধরা নিয়ম সৃষ্টি করা যায় না। পাত্রভেদে ইহার বিভিন্নতা হইবেই। সাধারণতঃ দেহের দৈর্ঘ্য, পরিসর ও ওজনের তারতম্যানুসারে আহারের পরিমাণের তারতম্য হয়। আরও একটি দ্রষ্টব্য বিষয়,—যাহাদের শারীরিক পরিশ্রম বেশী করিতে হয়, তাহাদের শর্করাপ্রধান শালিজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ চাল, গম প্রভৃতি বেশী প্রয়োজন হয় এবং যাঁহারা মস্তিষ্কজীবী তাঁহাদের আমিষ জাতীয় অর্থাৎ মাছ, মাংস, ছানা প্রভৃতি বেশী দরকার।

আরও দেখা যায়, দেশ ও কাল ভেদে আহারের পরিমাণের তারতম্য হয়। একজন বাঙ্গালীর পক্ষে যাহা যথেষ্ট, একজন পাঞ্জাবী বা পেশোয়ারীর পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। আবার, শীতকালে যতটা খাদ্য অক্লেশে পরিপাক করিতে পারা যায়, গ্রীষ্মে বা বর্ষায় ঠিক ততটা পরিপাক করা যায় না।

যাহাই হউক, আহার সম্বন্ধে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই স্ব স্ব মাত্রা জ্ঞান থাকা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে, খেয়াল রাখিতে হইবে যে, উক্ত নিয়মানুসারে গ্রহণযোগ্য খাদ্যে যথাসম্ভব খাদ্যের কার্য্যকর উপাদানগুলি যেন বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, যথাসম্ভব মিশ্র খাদ্যই খাওয়া উচিত; নচেৎ, খাদ্যগ্রহণের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হইবে না। বিভিন্ন গুণসম্পন্ন খাদ্য না খাইলে, দেহের সম্যক্ পুষ্টি ও ক্ষয় নিবারণ হইবে না।

পণ্ডিতেরা বিভিন্ন বয়সের উপযোগী এক একটা খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সে তালিকা অনুসারে কার্য্য করিলে,—সুফল লাভের আশা করা যায়। আমরা নিম্নে সে তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শিশু-খাদ্য সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলিব।

দৈনিক খাদ্য তালিকা

(স্বর্গীয় রসায়নাচার্য্য ডাঃ চুনীলাল বসু)

ব্যায়ামশীল উন্নতদেহ বাঙ্গালী বয়স্ক ছাত্রের—

চাউল—২½ ছটাক। দাল—১ ছটাক। মাছ বা মাংস—৩ ছটাক। আলু ও অন্যান্য তরকারী—৫ ছটাক। আটা—৫ ছটাক। সুজী—১ ছটাক। ঘৃত ও তৈল—১ ছটাক। চিনি বা গুড়—½ ছটাক। দধি—২ ছটাক।

সহজ পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক ১॥০ মন ওজনের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের—

চাউল—৩ ছটাক। আটা—৫ ছটাক। দাল—½ ছটাক। মাছ বা মাংস—২½ ছটাক। আলু—২ছটাক। অন্যান্য তরকারী—২ ছটাক। তৈল বা ঘৃত—½ ছটাক। দুগ্ধ—৮ ছটাক। লবণ—¼ ছটাক। মসলা যথাপরিমাণ।

একাদশ অধ্যায়

আহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

আহার বিধি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।—

(১) প্রত্যহ প্রত্যূষে খালি পেটে একগ্লাস শীতল বা সহমত গরম জল পান করিলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অনেক পুরাতন কোষ্ঠ-বদ্ধ রোগী ঐ অভ্যাসের ফলে সুফল পাইয়াছেন।

"দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্যস্য প্রয়োজনম্॥"

দিনান্তে দুগ্ধ, প্রত্যূষে জল এবং ভোজনান্তে ঘোল পান করিলে, বৈদ্য ডাকার প্রয়োজন হয় না।

(২) অজীর্ণ ও বাত রোগে চা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। প্রত্যূষে চা সেবন—পরিপাক-শক্তি হীনতার অন্যতম কারণ। চায়ের খাদ্যহিসাবে কোনই মূল্য নাই অথচ অপকারিতা যথেষ্ট। প্রাতে চায়ের পরিবর্ত্তে ঈষদুষ্ণ জলে একটা পাতিলেবুর রস মিশাইয়া পান করিলে, সকলেই উপকার পাইবেন; শিশুদের পক্ষে ইহা মহা উপকারী এবং বাত ও অজীর্ণ রোগীর ইহা নিত্যসেব্য ঔষধও বটে।

(৩) দিবসে প্রথম প্রহরের মধ্যে আহার করা উচিত নয়। ভাবমিশ্র বলেন, "যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং, যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।" অর্থাৎ প্রথম প্রহর বাদ দিয়া, দ্বিতীয় প্রহর মধ্যে আহার করা উচিত। আমাদের মনে হয়, বেলা নয়টা হইতে এগারোটার মধ্যেই আহারের প্রশস্ত কাল। অবশ্য রোগী ও শিশুর পক্ষে এ নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপাল্য নহে।

(৪) শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে" (আহ্নিক তত্ত্বম্) অর্থাৎ, স্নান না করিয়া যে খায়, সে মল ভোজন করে। বলা বাহুল্য, এখানে সুস্থদেহ ব্যক্তির কথাই বলা হইতেছে। স্নানের উদ্দেশ্য কি, তাহা লক্ষ্য করিলে আমরা শাস্ত্রকারের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি। "স্নানেন শুদ্ধি, ন তু চন্দনেন।" অপিচ, "নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে।" অর্থাৎ, নির্ম্মলতা ও মনের শুদ্ধি স্নান ব্যতিরেকে হয় না। স্নানের এই ফলটুকুর দিকে লক্ষ্য রাখিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, আহারের পূর্ব্বে শারীরিক নির্ম্মলতা ও মানসিক শুচিতা আবশ্যক, শাস্ত্রকার এই কথাই

বলিতেছেন। অপরন্তু, হাত মুখ না ধুইয়া খাইলে, কতকটা মল বা ময়লা যে পেটের মধ্যে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৫) গুরুতর শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের, অথবা উত্তেজনার পরেই, অথবা অশান্ত মনে আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হয় না।

(৬) শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে পঞ্চার্দ্র হইয়া, অর্থাৎ, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আহার করা উচিত। এ কথা যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্মত সে বিষয়ে লিপি-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধৌত করিলে, শ্রান্তিনাশ হয় ও শরীর শীঘ্রই স্নিগ্ধ হয় এবং একটা স্বস্তিবোধ ও শুচিভাব জন্মে।

(৭) ভোজ্যবস্তু শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, অনিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করিতে নাই। ভগবানের প্রসাদ রূপে যদি খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বতঃই মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়াই খাওয়া উচিত। তাহাতে অন্ন প্রীতিপ্রদ হয়।

(৮) পরস্পর সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য একত্রে আহার করিতে নাই। যথা ;—নানাজাতীয় মাংস একত্র রাঁধা হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। জলবহুল স্থানের পশুর মাংস ও মৎস্যের সহিত দুগ্ধ ভোজন অকর্ত্তব্য। সরিষার তৈলে ভর্জ্জিত কপোত মাংস অভক্ষ্য। গুড় অথবা মধুর সহিত মৎস্য খাইতে নাই। দুগ্ধযুক্ত ছাতুর সহিত মাংস খাওয়া অনুচিত। উষ্ণ দ্রব্যের সহিত দধি অথবা মধু ভোজন নিষিদ্ধ। দধি, তক্র ও বিল্বফলের সহিত কদলী অভক্ষ্য। সমান ভাগে মিলিত মধু ও ঘৃত বিষবৎ। খিচুড়ীর সহিত পায়সভক্ষণ নিষিদ্ধ।

(৯) অগ্নিপক্ক অন্ন ব্যঞ্জনাদি পুনরায় উষ্ণ করিয়া খাওয়া উচিত নয়। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে খুব উষ্ণদ্রব্য আহার করা একেবারেই অনুচিত।

(১০) আহারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে যে স্বল্পজলে গণ্ডুষ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতি উত্তম ব্যবস্থা। গণ্ডুষ অগ্নির দীপক। অপরন্তু, আহারের পূর্ব্বে যদি কণ্ঠনালী শুষ্কাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে গণ্ডুষ দ্বারা উহা সিক্ত করিয়া লওয়া যায়। আমাদের দেশে সর্ব্বাগ্রে ঘৃতসিক্ত অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, ইহাও অতি উত্তম প্রথা, —ইহার দ্বারাও শুষ্ক কণ্ঠনালীকে সিক্ত করা যায়। প্রথমেই কঠিন দ্রব্য আহার করা কখনো কর্ত্তব্য নহে।

(১১) ভুক্তবস্তু লালার সহিত ভালরূপ না মিশিলে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, এজন্য বেশ ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিলে ভুক্তদ্রব্যের সহিত লালারস বেশ ভাল করিয়া মিশিয়া থাকে।

(১২) আহারকালে বারংবার জল খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহার ফলে খাদ্যদ্রব্য অধিক তরল হওয়ায় পাচকরস সকল শক্তিহীন হইয়া থাকে। বরফ জল একেবারে বর্জ্জনীয়। আহারের দুই ঘণ্টা পরে জল সেবনীয়।

(১৩) আহারের স্থান বেশ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। দুর্গন্ধ ও ন্যক্কারজনক স্থানে আহার করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। স্থানের দোষই হউক অথবা দ্রব্যের দোষেই হউক, ঘৃণা উপস্থিত হইলে আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

(১৪) পাকযন্ত্র সবল রাখিবার জন্য পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হইলে আহার ত্যাগ করা উচিত। রাত্রিকালে উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করা একেবারে কর্ত্তব্য নহে।

(১৫) আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করা একান্ত আবশ্যক। আহারের পরই দৌড়ান বা দ্রুতগমন বিষবৎ বলিয়া মনে রাখা উচিত।

এখনকার দিনে অনেকে এ কথাটি স্মরণ রাখেন না বলিয়াই আমাদের দেশ এত অজীর্ণ-প্রধান।

(১৬) একরূপ খাদ্য প্রত্যহ খাওয়া উচিত নহে। একই দ্রব্য প্রত্যহ খাইলে অরুচি জন্মিয়া থাকে এবং তাহার ফলে শরীরে রোগ সঞ্চয় সম্ভবপর। পঞ্জিকায় অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য খাইতে নাই বলিয়া যে সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমাদের আর্য্যঋষিগণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সকল বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে গুলি মানিয়া চলিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

(১৭) হোটেল বা রেষ্টুরাঁগুলিতে আহার করা কোনক্রমেই উচিত নহে। সে সকল স্থানে উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি ভাল করিয়া ধৌত করা হয় না, ফলে ইহার দ্বারা অনেকসময় নানারূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইতে পারে।

(১৮) হোটেল বা রেষ্টুরাঁ গুলির মত সাধারণ চায়ের দোকানে চা-পান সম্বন্ধেও একই কথা। চায়ের দোকানে চা-পান করিয়া যে সংক্রামক রোগকে ডাকিয়া আনা হইতেছে, সে কথা সরকারী ও স্বাস্থ্যসমিতি গুলির রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে।

(১৯) কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সময় ঠাণ্ডা জিনিষ আদৌ খাওয়া উচিত নহে। কোন স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাও এরূপ সময়ে ঠিক নহে।

(২০) আহারের পর কি শারীরিক, কি মানসিক—কোনরূপ পরিশ্রম করাই কর্ত্তব্য নহে, কারণ পাকক্রিয়ার সময় পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। আহারের পর পরিশ্রম করিলে মস্তিষ্ক বা অন্যস্থানে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হওয়ায় সাধারণ রক্ত-সঞ্চালনের ক্ষতি হয়। এজন্য পাকক্রিয়ার হ্রাস ঘটিয়া থাকে।

আহারের ঠিক অব্যবহিত পরেই নিদ্রা ও স্নান এই জন্য বর্জ্জনীয়। রাত্রে নিদ্রা যাইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আহার করা উচিত।

(২১) জোর করিয়া কখনো নিজেও খাইতে নাই, কাহাকেও খাইতে অনুরোধ করিতে নাই। আমাদের দেশের অনেক জননী এ কথাটা বুঝেন না, তাঁহারা অনেক সময় সন্তান সন্ততিকে বেশী করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার ফল অনেক সময়ই বিষময় হইয়া থাকে।

(২২) আহারের কিছুক্ষণ পরে বামপার্শ্ব চাপিয়া অল্পক্ষণ শয়ন করিলে ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়।

(২৩) ঠিক একই সময়ে আহার করা কর্ত্তব্য। আজ দশটায় কাল এগারটায়, পরশু বারটায় আহার করা উচিত নহে। ঠিক একই সময়ে পরিমিত ভোজনে আয়ু এবং বলের বৃদ্ধি, এবং সময় ঠিক না রাখিয়া ও অপরিমিত ভোজনে আয়ুক্ষয় হয় এহং রোগাক্রান্ত হইতে হয়—এই দুইটি কথা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(২৪) আহারের পর ভাল করিয়া মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। এখনকার দিনে অনেকে ইহা মানিতে চাহেন না। নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অনেকে গ্লাসের জল দ্বারাই কোনরূপে মুখ প্রক্ষালনের কার্য্য সারিয়া থাকেন। ইহার ফলে মুখগহ্বর ভালরূপে পরিষ্কার হয় না,— ফলে দন্ত-রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। দাঁত থাকিতে দাতের মর্য্যাদা আমরা বুঝিনা।

(২৫) ঘন ঘন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। আবার বহু বিলম্বে ভোজন করিলেও অনিষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্য নিজের পরিপাক-শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আহার গ্রহণের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিতে পাকস্থলীর চারিঘণ্টা পরিশ্রম হয়। তাহার পরেও দুই ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক।

বয়স্ক ব্যক্তির মোটামুটি চারিবারের অধিক আহারের প্রয়োজন হয় না। কোন্ দ্রব্য পরিপাক করিতে কত সময় লাগে সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা থাকা ভাল।

আমরা নিম্নে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য কতিপয় দ্রব্যের পরিপাক কাল নির্দ্দেশ করিতেছি :—

খাদ্য	পরিপাকের ঘণ্টা	খাদ্য	পরিপাকের ঘণ্টা
ভাত	২	ছাগ, মেষ, হরিণমাংস	৩
		ঐ ভাজা (চপ, কাটলেট)	৪
দাল	৩-৪	গোলআলু ফুলকপি, বাঁধা কপি	৩
কাঁচা ছোলা, মটর	২৸৹		
মুগের যুস	১	ঝিঙ্গে, এঁচোড়, কাঁচকলা পটল ও বেগুন	২৷৹
খিচুড়ী	৩-৪		
পলান্ন	৫		
পায়সান্ন	৪	মূলা, গাজর	৩
যবের, চিঁড়ার খইএর মণ্ড	১৷৹-২	ডিম (কাঁচা)	২৷৹
পুরাতন চালের মণ্ড	১	ঐ অর্দ্ধ সিদ্ধ	৩
সাগু, বার্লি, এরারুট	১-২	ঐ সুসিদ্ধ	৩৷৹
মুড়ি	১৷৹	দুধ	২
খই	১।৹		
পাঁউরুটি	৩	ডালিম	১
রুটি	২৷৹	বাদাম পেস্তা	৪
		আম	২
লুচি, কচুরি	৩৸৹	কাঁঠাল	৩

মিছরি, বাতাসা।	২	আনারস	২॰
গুড়, সন্দেশ, চিনি	৩	ঝুনা নারিকেল	৩
অন্যান্য মিঠাই	৩	বেল	২
রোহিত ও অন্যান্য সিদ্ধ মাছ	২॥॰		
ইলিস ও চিংড়ি	৩		
ক্ষুদ্র মাছ	২		

(২৬) যে ব্যক্তি প্রাতে কি কি দ্রব্য দিয়া ভাত খাইয়াছে তাহা বৈকালে সহজে স্মরণ করিতে পারে না,—সাধারণতঃ তাহার পরিপাক শক্তি উত্তম।

(২৭) মধ্যে মধ্যে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। লঙ্ঘন শব্দের অর্থ লঘুতা সম্পাদন,—অর্থাৎ নাম মাত্র লঘু আহার। নিতান্ত ক্ষীণব্যক্তি ব্যতীত অপর যে কোন ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে উপবাস করেন, তিনি ব্যাধিকে দূরে রাখিতে পারেন। এজন্য উপবাস প্রায় সকল ধর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ।

দ্বাদশ অধ্যায়

রন্ধনশালা ও তৈজসপত্র

১। রান্নাঘরকে ঠাকুর ঘরেরই মত পবিত্র জ্ঞান করা উচিত। আমরা জুতাপায়ে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিনা; কিন্তু, রান্নাঘরের সম্বন্ধে অনেকেই আজকাল এ নিয়মটুকু মানেন না। জুতার সঙ্গে পথের ধূলা-কাদা আসে, পথের ধূলা-কাদায় অসংখ্য ব্যাধি-বীজাণু বিদ্যমান। সাধ করিয়া সে গুলিকে রান্নাঘরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন কি?

২। বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে স্যাঁত সেঁতে আলো-বাতাসহীন ঘরটিই সাধারণতঃ রান্নাঘর এবং তথায় ধূম নিবারণের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে না। বোধ হয় এই কারণেই সহর অঞ্চলে গৃহস্থনারীর মধ্যে আজকাল যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্য। আজকাল কলিকাতায় কোন কোন বাড়ীতে গৃহের সর্ব্বোচ্চ তলে রান্না ঘরের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বসতি-বহুল স্থানের পক্ষে এ প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৩। রান্নাঘরের সন্নিকটে উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী থাকা উচিত নয়। পল্লীগ্রামে রান্নাঘরের সন্নিকটেই ফেন ফেলার গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফেন ফেলা যে উচিত নয়, এ কথা পল্লীবাসী যে দিন বুঝিবেন, সে দিন ঐ অস্বাস্থ্যকর প্রথা উঠিয়া যাইবে, আশা করা যায়।

৪। খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ কোনক্রমে বসিতে না পারে, সে জন্য সর্ব্বদা তরিতরকারী, মাছ-মাংস ঢাকিয়া রাখা উচিত। আঢাকা দুধ সহজেই বায়ু হইতে বীজাণু আকর্ষণ করে। মাটিতে আঢাকা অবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্যই রাখা উচিত নয়।

৫। পাচক পাচিকা সম্পূর্ণ নীরোগ অবস্থায়, শুচিভাবে, পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া রন্ধন করিবেন এবং কোন প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন হস্তদ্বারা স্পর্শ না করিয়া হাতা বা চামচ সাহায্যে পরিবেশন করিবেন। অন্ন-ব্যঞ্জন হাতে করিয়া ঘাঁটিলে শীঘ্রই বিস্বাদ হইয়া যায়।

৬। শাকসব্জি, মাছ, মাংস, চাল, দাল, প্রভৃতি বিশুদ্ধ পানীয় জলে ধৌত করিয়া ব্যবহার করা উচিত। শাকাদি যথেষ্ট যত্ন সহকারে না ধুইলে, অনেক দূষিত পদার্থ উহার মধ্যে থাকিয়া যায়।

৭। শাকসব্জির খোলা ও অন্যান্য আবর্জ্জনা যথাসম্ভব সত্বর রান্নাঘর হইতে দূরীভূত করিলে, মাছি ও অন্যান্য কীটের উপদ্রব কমিয়া যাইবে।

৮। সর্ব্বদা বিশুদ্ধ পানযোগ্য জলে ধৌত বাসন ব্যবহার করা উচিত। আজকাল এলুমিনিয়মের বাসনের খুব প্রচলন হইয়াছে; এলুমিনিয়মের দ্রব্যে ঘৃত ও তৈলময় খাদ্য বহুক্ষণ থাকিলে, সময় সময় বিষাক্ত হইয়া উঠে। কলাইকরা তামার রন্ধনপাত্রের কলাই উঠিয়া যাওয়াতে, অনেক ক্ষেত্রে ফল বিষময় হইয়াছে। আমরা কলাই করা তামার রন্ধন পাত্র ব্যবহার করার আদৌ পক্ষপাতী নহি। এনামেল করা পাত্রের 'চটা' উঠিয়া গেলে ভাল পরিষ্কার হয় না, সুতরাং ঐরূপ 'চটা' উঠা এনামেল পাত্র পরিত্যজ্য। মাটির হাঁড়িতে প্রস্তুত অন্নই প্রশস্ত।

৯। আমাদের বাসনমাজা-প্রথা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। পল্লীগ্রামে পুকুরের যে ঘাটে স্নান ও শৌচ করা হয়, সেই ঘাটেরই পাঁক মাটিতে সাধারণতঃ বাসন মাজা হয়। সহরের লোক ধূলা, মাটি, পচা খইল, গোবর, যখন যা হাতের কাছে পায়, তাই দিয়া বাসন মাজে। আমাদের মধ্যে যে যে কারণে সংক্রামক ব্যাধি-গুলি এত সহজে ছড়াইয়া পড়ে, বাসন মাজার অসাবধানতা তাহার

একটি কারণ। বাসন মাজার পক্ষে উনানের ছাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, অথচ এ জিনিষ সহজলভ্য। প্রায়ই দেখিতে পাই, কলিকাতার ঝিয়েরা কলে উচ্ছিষ্ট বাসন ধুইবার সময়, একটা মান্ধাতার আমলের পুরাতন, অতি মলিন ন্যাতা ব্যবহার করে। বাসন ধুইতে এ ন্যাতা ব্যবহারের কি প্রয়োজন হয়, তাহা বুঝি না। প্রত্যেক বাসনই ব্যবহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আর একবার বিশুদ্ধ জলে ধুইয়া লওয়া উচিত।

১০। আমাদের রান্নাঘরে গোময়ের অবাধ রাজত্ব স্মরণাতীত কাল হইতে চলিতেছে দেখিয়া, অনেকেই গোময়ের ব্যাধি বিনাশক শক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক তথ্য শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু, গাভীর প্রতি যতই ভক্তি থাক, জিনিষটা যে আদৌ প্রীতিপদ নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব, এতটা উৎকট গোময়-প্রীতির কারণ কি?—অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে গোবর পূর্ব্ব হইতে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়; এজন্য, উহা স্বভাবতঃই পচিয়া উঠে, এবং সেই পচা বিষ্ঠা চুলীতে এবং রান্নাঘরে লেপন করিয়া আমরা শুচিতা রক্ষা করি। ইহার উপরে, যদি গরু কোন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। টাট্‌কা গোবরেও যে মাছি ও কীটাদি আকৃষ্ট হয়, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি শুদ্ধিও শুচিতা রক্ষা করাই গোময় লেপনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব,—বিশুদ্ধ জলই সে কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট, তবে মধ্যে মধ্যে ঐ জলে কিছু চূণ মিশাইয়া লওয়া উচিত। অবশ্য রান্নাঘরের কক্ষতল যদি মৃত্তিকা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে উহার দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য, গোবর ব্যবহার করা দরকার হয় বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্যাধিশূন্য গরুর টাট্‌কা গোবর ব্যবহার করা উচিত; তবে প্রত্যহ নয় এবং কক্ষতল সম্পূর্ণ শুষ্ক না হইলে কক্ষটি ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য।

রন্ধনশালার রীতিনীতি, রন্ধনবিধি ও তৈজসপত্রাদির পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞানপাপী। আলস্য ও ঔদাস্যই ইহার কারণ। ঐ আলস্য এবং ঔদাস্যের ফলে, পরিণামে আমাদের কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সকলে, বিশেষ করিয়া পুরমহিলারা, যে দিন বুঝিবেন, সে দিন জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। জার্ম্মানীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উপযোগী আদর্শ রন্ধনশালা গড়িয়া, মেয়েদের এ সব বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিশু-খাদ্য

শিশুখাদ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, তিনটি বিষয় নজরে পড়ে। ধনী ও মধ্যবিত্তের সংসারে অতিভোজন (overfeeding) কিম্বা অহিতভোজন (wrong feeding) এবং অভাবের সংসারে, খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য (underfeeding)। এই তিনটিই সমান দোষাবহ।

দুধ

দুধ শিশুর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। কিন্তু, নানাকারণে একদিকে খাঁটি দুধ যেমন দুর্লভ, অন্যদিকে যেমন তেমন দুধই হউক উহার দাম নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে। খাদ্য-সমস্যার কোন সমাধান করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য না হইলেও, আমরা বলিতে বাধ্য যে, দুধের চাহিদা যতটা বাড়িয়া গিয়াছে, ততটা খাঁটি দুধ যোগান দেওয়া

বর্ত্তমানে অসম্ভব। যতদিন না সমর্থ গৃহস্থ আবার গো-পালনে মনোযোগী হইতেছেন, ততদিন এ সমস্যার সমাধান হইবে না। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বলিতে হয় যে, যেখানে শিশু ও রোগী এবং সন্তানসম্ভবা নারী ও স্তনন্ধয় শিশুর জননী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পায় না, সেখানে কোন বয়স্ক ব্যক্তির দুগ্ধপানের অধিকার নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কোন প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, লণ্ডনে ও প্যারিসে কলিকাতার চেয়ে দুধ দামে সস্তা, অথচ একেবারে নির্জ্জলা! মনে রাখিতে হইবে, ও দেশে দুধ প্রধানতঃ শিশুর খাদ্য এবং রোগীর পথ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই, সেখানে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অস্বাভাবিক বৈষম্য নাই। আর তা' ছাড়া, ঐ সকল জাতি গো-পূজক হিন্দুর চেয়েও অধিক পরিমাণে গো-পালনে এবং গো-সেবায় তৎপর।

যাহাই হউক, এক হইতে পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক শিশুর প্রত্যহ অন্ততঃ একসের খাঁটি গো-দুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ দরকার হয়। ছাগ পালনের ব্যয় অতি অল্প, পল্লীগ্রামে কোন খরচ নাই বলিলেই চলে। অথচ, সহরে ছাগদুগ্ধের দাম অত্যন্ত বেশী এবং ছাগদুগ্ধের ব্যবসায়টা পশ্চিমাদের হস্তগত। অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থ ছাগ পালনে সক্ষম, কিন্তু, একটা অন্ধ সংস্কারের বশে করেন না। জানিয়া রাখা ভাল,—ছাগদুগ্ধ মুখঢাকা পাত্রে রাখিয়া জলপূর্ণ কড়ায় বসাইয়া জ্বাল দিলে সমধিক গুণশালী হয় এবং ছাগদুগ্ধ জ্বাল দিবার রীতিই এই।

(২) অন্যান্য দ্রব্য

(ক) স্বচ্ছল সংসারে শিশুকে অধিক দিন পর্য্যন্ত শুধু দুধ খাওয়াইয়া রাখা হয়। অনেক জননী মনে করেন, শিশুকে অল্প বয়স হইতে ভাত খাইতে অভ্যস্ত করিলে, উহাদের 'ভেতো' চেহারা হয়, পেট মোটা

হয়, ইত্যাদি। ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। অধিক পরিমাণে না খাইলে কিছুতেই পেট মোটা হয় না। দরিদ্রের শিশু অল্প বয়স হইতে ফেন ভাত খাইয়া যথেষ্ট বল সঞ্চয় করে; আর এই সব ভদ্র সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যেই যকৃতের পীড়া বেশী দেখা যায়। এক বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুকে ধীরে ধীরে অল্প পরিমাণে ভাত খাওয়া অভ্যাস করানো উচিত। প্রথম হইতেই পুরাতন আতপ চাউলের ভাত অভ্যাস করাইয়া দিলে উপকার আছে, অথচ অজীর্ণের আশঙ্কা নাই।

(খ) প্রত্যহ কিছু কিছু শাকসব্জি শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত। শিশু সহজে তরকারী খাইতে চাহে না, তরকারীর মধ্যে আলুটাই স্বেচ্ছায় খাইয়া থাকে। বেশী আলু খাওয়ার দরুণ অনেক শিশুর অনাবশ্যক মেদ বৃদ্ধি হয়। যতদিন না ভাল করিয়া চিবাইতে শেখে, ততদিন পর্য্যন্ত শাকসব্জির সুরুয়া তৈয়ারী করিয়া দেওয়া উচিত। মাংসের যে ভাবে সূপ বা সুরুয়া প্রস্তুত হয়, সেই ভাবে আস্ত শাক-সব্জিকে ছোট ছোট খণ্ড করিয়া অত্যল্প মসলা সংযোগে সিদ্ধ করতঃ সিদ্ধ সব্জিগুলি চটকাইয়া ক্বাথটুকু ছাঁকিয়া লইতে হইবে। শিশু চিবাইয়া খাইতে শিখিলে, ছাঁকিবার প্রয়োজন নাই, তবে শিশু যাহাতে ঐ সব্জিগুলি ভাল করিয়া চিবাইয়া ছিব্‌ড়াগুলি ফেলিয়া দেয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিলেই হইল। প্রসিদ্ধ খাদ্যতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায় বলেন, ফেনের সহিত উক্ত প্রকারে সব্জি সংযোগ করিয়া ঝোল প্রস্তুত করিয়া দিলে বেশ পুষ্টিকর শিশুখাদ্য প্রস্তুত হয়, অথবা ফেনের সহিত লবণ, লেবুর রস এবং অল্প গুড়সংযোগ করিয়া শিশু-দিগকে খাইতে দেওয়া উচিত।

(গ) ছোট ছোট মাছ বা মাছের ঝোল দেওয়া চলিতে পারে। এ বয়সে মাংস না দেওয়াই ভাল। কাঁচা ডিমের কুসুমটুকু মধ্যে মধ্যে দিলে উপকার আছে।

(ঘ) প্রত্যহ কিছু কিছু সময়ের টাট্‌কা ফল বা ফলের রস, অভাবে কাগজি বা পাতিলেবুর রস গুড় সহযোগে, দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা চিবাইয়া খাইতে শিখিয়াছে, তাহাদিগকে ইক্ষু প্রভৃতি দাঁতে ছাড়াইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যহ কিছু কিছু শক্ত জিনিষ দাঁতে চর্ব্বণ করিয়া খাইলে, দাঁত শক্ত হয় এবং চিরকাল ভাল থাকে। শিশুরা বাদাম, চীনাবাদাম, ছোলা, মটর প্রভৃতি জিনিষ প্রাকৃতিক প্রেরণাতেই ভালবাসে।

(ঙ) শিশুর জলখাবার হিসাবে অনেক পুষ্টিকর সাধারণ জিনিষ সস্তায় পাওয়া যায়। আমরা সেগুলিকে হয় অবহেলা করি, নয় স্বাস্থ্য-নাশের ভয়ে দেই না। এই ভয় অমূলক, মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই। আঙ্গুর, আপেল, ন্যাশপাতি, বেদানা, কিসমিস্, মনাক্কা, আখ্‌রোট, খোবানি, খেজুর, প্রভৃতি মহার্ঘ ফল নাই জুটুক, শশা, কলা, বিলাতি বেগুন, কাঁচাপিঁয়াজ, জাম, জামরুল, মিষ্ট কুল, পিয়ারা, ফুটি, তরমুজ, আনারস, পেঁপে, আম, কাঁঠাল, আক, যখন যাহা জুটিবে তাহাই নির্ভয়ে শিশুদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। বাজারের খাবার বিষবৎ পরিত্যজ্য। তৎপরিবর্ত্তে মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়া, খই, ছোলাসিদ্ধ, কলাই শুঁটি (কাঁচা বা সিদ্ধ), অঙ্কুরিত ছোলা, ভিজা মুগ, চীনাবাদাম, মটর প্রভৃতি; ঘরে প্রস্তুত ছোলার চাক, মুড়ির চাক, চিঁড়ের চাক, মোহন ভোগ ইত্যাদি।

(চ) চিনি শিশুদের উপযোগী নয়। চিনি সেবনে উহাদের অনিষ্ট হয়, চিনির পরিবর্ত্তে গুড় দেওয়া উচিত।

(৩) অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

(ক) শিশুর দাঁত যাহাতে পরিষ্কার থাকে—তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। শক্ত জিনিষ না খাইলে দাঁত ও মাড়ী শক্ত হয় না।

(খ) প্রত্যেকবার খাইবার পূর্ব্বে শিশু যাহাতে হাত ধুইতে শেখে, সেই অভ্যাস করানো উচিত। সাধারণতঃ শিশু খাইবার পূর্ব্বে হাত ধোয় না।

(গ) নিজেরা খাইতে বসিলেই, শিশুর মুখে যখন তখন কিছু খাদ্যাংশ তুলিয়া দেওয়া উচিত নয়। স্নেহের নামে, অজ্ঞাতসারে তাহাদের ক্ষুদ্র পাকস্থলীর উপর অত্যাচার করা হয়।

(ঘ) সূতিকাঘর হইতেই শিশু যাহাতে রাত্রি দশটার পর কিছু না খায়, সে অভ্যাস করানো উচিত। আমরা দেখিয়াছি, সূতিকাগারে যদি প্রথম হইতেই রাত্রি দশটার পর শিশুকে স্তন্যদান না করা যায়, তাহা হইলে প্রথম দুই একটা দিন শিশু কাঁদে বটে, কিন্তু তৎপরেই তাহার অভ্যাস হইয়া যায় এবং অকাতরে নিদ্রা যায়। ইহাতে শিশুর কোনই ক্ষতি হয় না। ইহা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে, পরন্তু শিশুর পক্ষেও মঙ্গলজনক, জননীর পক্ষেও আরামদায়ক।

(ঙ) শিশুর আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত।

(চ) প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠপরিষ্কার হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পর বয়স্ক শিশু যাহাতে মলত্যাগের চেষ্টা করে, সে অভ্যাস করানো ভাল।

(ছ) প্রত্যহ সকালে এবং বৈকালে রৌদ্রসেবন শিশুদেহের পক্ষে আহারেরই মত প্রয়োজনীয় এবং বলপ্রদ। তবে, বাড়াবাড়ি ভাল নয়। গ্রীষ্মের রৌদ্র বায়ুবর্দ্ধক এবং শরতের রৌদ্র পিত্তকর। তবে, উদীয়মান সূর্য্যের কিরণ সকল সময়েই হিতকর, কিন্তু অত সকালে শিশুর দেহে উপযুক্ত আচ্ছাদন থাকা দরকার।

(জ) ছোট শিশুর দুধের তালিকা,—

বয়স	দুধ	জল	পরিমাণ	সময়ের ব্যবধান
১ সপ্তাহ—	১ ভাগ—	২ভাগ—	½ ছটাক—	৩-৪ ঘণ্টা
১ মাস—	২ ভাগ—	৩ ভাগ—	১ ছটাক—	৪ ঘণ্টা
৩ মাস—	১ ভাগ—	১ ভাগ—	½ পোয়া—	৪ ঘণ্টা
৬ মাস—	৩ ভাগ—	১ ভাগ—	১ পোয়া—	৪ ঘণ্টা

(ঝ) তিন হইতে পাঁচ বৎসরের ছেলের উপযুক্ত মোট দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ :— চাউল— ½ ছটাক, ডাল— ½ ছটাক। আলু —১ ছটাক। অন্যান্য তরকারী ১ ছটাক। দুধ— ৩ পোয়া। কাঁচা ডিম— ১টা। গুড়—½ ছটাক। চিঁড়া বা মুড়ি— ¼ ছটাক। যে কোন ফল উপযুক্ত পরিমাণে।

(ঞ) ছয় বৎসরের ছেলের উপযুক্ত মোট দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ। চাউল—১ ছটাক। দাল— ½ ছটাক। মাছ বা মাংস—১ ছটাক। ডিম—১টা। ঘৃত—¼ ছটাক। আলু—১½ ছটাক। অন্য তরকারী —১½ ছটাক। আটা—১ ছটাক। গুড়—½ ছটাক। চিঁড়া বা মুড়ি—½ ছটাক। যে কোন ফল উপযুক্ত পরিমাণে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ঋতুচর্য্যা

"গ্রীষ্মচর্য্যা"

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের তেজ অতিশয় খরতর হয়, এজন্য কফের হ্রাস ও বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই কারণে এই সময় লবণ ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা বিধেয় নহে। শাস্ত্রে উক্ত আছে "ভজেন্মধুর যে বান্নং লঘু-স্নিগ্ধ-হিমং দ্রবং সুশীতং তোয়সিক্তাম্মো লিহ্যাৎ শক্তূন্ সশর্করান্।" অর্থাৎ এ সময় মধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রব অন্ন এবং শর্করা মিশ্রিত সজল শক্তু ভোজন ও প্রত্যহ সুশীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। পানীয় জল কর্পূর সংযোগে সুগন্ধিকৃত করিয়া কুঁজা, কলসী প্রভৃতি মৃৎপাত্রে রক্ষিত করিবে। ব্যায়াম ও রৌদ্রসেবন এই ঋতুতে বিষবৎ পরিত্যজ্য। দিবানিদ্রা দ্বারা কফ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—এজন্য ইহা অন্য ঋতুতে অহিতকর হইলেও, গ্রীষ্মকালে কফের ক্ষয় নিবন্ধন ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। এই ঋতুতে মধ্যাহ্ন কালে বিশ্রাম করা একান্ত আবশ্যক।

"বর্ষাচর্য্যা"

এই সময় আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সর্ব্বদা প্রচুর বারিবর্ষণ হয়। ফলে প্রাণীদিগের শরীরও আর্দ্রতা প্রবণ হইয়া থাকে। মানব শরীরে গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় যাহাতে বায়ু প্রশমিত হয়, বর্ষাঋতুতে তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই সময় আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আহারের ব্যতিক্রমে

অগ্নিমান্দ্যের সম্ভাবনা অত্যধিক। গুরু ভোজন করিলে এ সময় সহজে পরিপাক হয় না। এজন্য লঘু দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে ঋতুর উপযোগী শয়ন, আহার, শয্যা, পরিচ্ছদ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ যত্ন করিবে। বৃষ্টির সময় জলে ভিজিবে না। গাত্র সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। সমস্ত পানীয় দ্রব্যের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এ সময় সুফলদায়ক হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল, কূপ, সরোবর, নদী ও পুষ্করিণীর জল উষ্ণ করিয়া, শীতল হইলে সেই জলে স্নান করা এ সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হইয়া থাকে। এ সময়ে সহমত ব্যায়াম করা উচিত।

"শরৎচর্য্যা"

এই সময় বর্ষার শৈত্য অভ্যস্ত হইবার পর, শরীর শরদাগমে সহসা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত হওয়ায় সঞ্চিত পিত্ত প্রায়ই প্রকুপিত হয়। এজন্য শরৎকালে মধুর ও লঘু, শীতল ও ঈষৎ তিক্ত, পিত্তনাশক খাদ্য ক্ষুধাকালে যথা মাত্রায় ভোজন করিবে। এই সময়—হরিণ-শশকাদির মাংস, শালি ধান্য ও যব, তণ্ডুল ও গোধুম আহার হিতকর। মধ্যে মধ্যে বিরেচন লওয়া আবশ্যক। যাহা তিক্ত ও পিত্তনাশক, সেইরূপ আহার—এই সময় প্রশস্ত। পলতা, উচ্ছে, পটোল, বেগুন, ডুমুর, মোচা, থোড় ও দেশী কুমড়া প্রভৃতির তরকারী আহার এই সময় প্রশস্ত। এই সময় রৌদ্রসেবন ও দিবানিদ্রা একেবারে বর্জ্জনীয়। দধি ও ক্ষার দ্রব্য এ সময় বর্জ্জনীয়।

"শীত ও হেমন্তচর্য্যা"

শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম—এই তিন ঋতু উত্তরায়ণ ও অবশিষ্ট তিন ঋতু দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণ কাল প্রতিদিন মনুষ্যগণের বল আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে, এই জন্য উত্তরায়ণ কালের অপর নাম—

আদান কাল এবং দক্ষিণায়ণ কাল মানবদিগকে বল বিসর্জ্জন অর্থাৎ প্রদান করে বলিয়া দক্ষিণায়ণ কালের অপর নাম বিসর্গকাল।

আদান কালে সূর্য্য ও বায়ু অতিশয় তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া পৃথিবীর সৌম্য গুণ নাশ করে। শীতঋতুতে তিক্ত, বসন্ত ঋতুতে কষায় এবং গ্রীষ্ম, শীত ও হেমন্ত ঋতুতে কটুরস বীর্য্যশালী হয়, এ জন্য আদান কালকে আর্য্য ঋষিগণ আগ্নেয় কাল বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঋতুতে মনুষ্যদিগের অধিক বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সময়—শীত সংযোগে লোমকূপাদি রন্ধ্র সকল সঙ্কুচিত হওয়ায় দৈনিক উষ্মা নির্গত হইতে না পারায় কোষ্ঠাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া উহাকে বলবান করে। এই জন্য এই ঋতুতে যথেষ্ট পরিমাণে ভোজ্য গ্রহণ আবশ্যক। স্বাদু, অম্ল, লবণস্বাদ-দ্রব্য ভোজন করাই এই কালে প্রশস্ত। এই সময় ভোজ্য গ্রহণে ধাতু পাক নিবারিত হয়। মেদস্বী পশুর মাংস, গোধূমচূর্ণ, মাষকলাই, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বসা ও তিল,—এই সমস্ত দ্রব্য সেবন হিতকর। উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্রসেবা, স্বেদগ্রহণ এবং অঙ্গাবরণ ব্যবহার এইকালে কর্ত্তব্য।

কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য, লঘুপাচ্য দ্রব্য ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি এই কালে পরিত্যজ্য। সকল প্রকার মিষ্টান্ন ভক্ষণ, এবং স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার এই ঋতুতে হিতকর।

"বসন্তচর্য্যা"

হেমন্ত কালে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্ত কালে সূর্য্যের প্রখর কিরণ স্পর্শে কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করে। তজ্জন্য বসন্ত কালে বহুবিধ শ্লেষ্মজ রোগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং এই সময় বমনাদি-

দ্বারা শ্লেষ্মা বহির্গত করিয়া দেওয়া উচিত। এই কালে লঘুপাক, রুক্ষবীর্য্য, কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ রসযুক্ত অন্নাদি, হরিণ প্রভৃতির লঘু মাংস আহার উপকারী। গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং অম্ল ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি এই কালে অনিষ্টজনক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পথ্য প্রকরণ

এরারুট—এরারুটে নানারূপ শ্বেতসার জাতীয় ভেজাল চলিতেছে। সুতরাং, দেখিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট এরারুট সংগ্রহ করা দরকার। প্রথমে অল্প একটু ঠাণ্ডা জলে ৩ চামচ এরারুট উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। পরে আধসের ফুটন্ত জল উহাতে অল্পে অল্পে ঢালিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া লইবে, যেন ডেলা না বাঁধে। তৎপরে আধছটাক চিনি বা মিছরি যোগ করিয়া, মৃদুজ্বালে ২।৩ মিনিট ফুটাইয়া লইবে। শটী—উপরোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, তবে জ্বালটা ৭ মিনিট দিতে হইবে।

বার্লি—অল্প একটু ঠাণ্ডা জলে দুই চামচ বার্লি উত্তম রূপে মিশাইয়া লইয়া পরে আধসের জলে গুলিয়া ২০ মিনিট কাল জ্বাল দাও। যত বার পথ্য দিতে হইবে, ততবারই নূতন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া দরকার।

সাগু—দুই চামচ সাগুদানা প্রথমে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে, পরে আধসের জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে।

পরে, মৃদুজালে চাপাইয়া দিয়া, ১ পোয়া অবশেষ থাকিতে ২ চামচ চিনি বা মিছরি চূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া নামাইয়া লইবে। দুধ সাগু প্রস্তুত করিতে হইলে, ঐ রূপে প্রস্তুত সাগুর সহিত উষ্ণ দুধ মিশাইয়া লইতে হয়। দুধের পরিমাণ সম্বন্ধে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়াই উচিত। আজ কাল সাগুতে ক্যাসাভা নামক দুষ্পাচ্য পদার্থ ভেজাল দেওয়া হয়, সুতরাং ক্রয় কালীন সাবধান হইবে।

ভাতের মণ্ড—আধসের জলে উত্তমরূপে ধৌত এক ছটাক পুরাতন চাউল দিয়া, মৃদুজালে ফুটাইতে ফুটাইতে জল যখন বেশ কমিয়া যাইবে, তখন নামাইয়া জ্বলন্ত চুল্লীর পাশে ১ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। বলা বাহুল্য, জাল দিবার সময় মধ্যে মধ্যে নাড়া দরকার, নচেৎ তলা ধরিয়া যাইবে। পরে, গরম থাকিতে থাকিতে, মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে ভাতের মণ্ড পাওয়া যাইবে। ঐ মণ্ডে আবশ্যক মত লবণ ও লেবুর রস অথবা চিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

খই মণ্ড।—এক পোয়া গরম জলে দুই মুঠা টাট্‌কা খই পনের মিনিট ফেলিয়া রাখিবে। পরে উত্তমরূপে উনানে ফুটাইয়া লইয়া, শীতল হইবার পূর্ব্বে মোটা কাপড়ে বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ফুটাইবার সময় বেশ করিয়া নাড়িবে, যেন তলা না ধরে এবং ঐ সময় দুই চামচ চিনি যোগ করিবে।

চিঁড়ার মণ্ড—উত্তমরূপে ধৌত দুই চামচ চিঁড়া এক পোয়া গরম জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। উহা উত্তমরূপে নরম হইলে, আধপোয়া গরম জল মিশাইয়া পাঁচমিনিট উনানে ফুটাইয়া লইবে। পরে, শীতল হইবার পূর্ব্বে মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। উহার সহিত পরিমাণ মত লবণ, লেবুর রস অথবা চিনি মিশাইয়া রোগীকে দিবে।

মানমণ্ড।—রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ককরা মানকচুর চাকা হামান-দিস্তায় উত্তমরূপে চূর্ণ-করতঃ পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ চূর্ণের **আধছটাক** এবং **একছটাক** পুরাতন আতপ চাউলের চূর্ণ একত্রে মিশাইয়া একটা পাত্রে কিছুক্ষণ অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখ। পরে উহার সহিত **৩ পোয়া** জল, **৩ পোয়া** খাঁটি দুধ ও একছটাক চিনি মিশাইয়া মৃদু জালে উত্তমরূপে ফুটাইয়া গাঢ় করিবে। শীতল হইলে, রোগীকে খাইতে দিবে।

দালের যূস—এক পোয়া সোনামুগ বা মসুরের দাল উত্তমরূপে ধুইয়া, কিছু লবণ, ২।১ খানি তেজপাত এবং অল্প কয়েকটা আস্ত ধনিয়া মিশাইয়া এক সের জলে **এক ঘণ্টা** সিদ্ধ কর। পরে, নামাইয়া ছাঁকিয়া লও।

পোরের ভাত—ঘুঁটের জালে, ছোট মাটির হাঁড়িতে যথা পরিমাণ পুরাতন চাল ও জল চড়াইয়া দাও। চালগুলি উত্তম রূপে সিদ্ধ হইয়া যখন গলিয়া যাইবার মত হইবে তখন নামাইয়া লও এবং গরম থাকিতে থাকিতে রোগীকে বা শিশুকে দাও।

ছানার জল—ফুটন্ত দুধ নামাইয়া, তাহাতে পাতি বা কাগজি লেবুর রস যোগ করিলে ছানা কাটিয়া যায়। উহা পরিষ্কৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলেই ছানার জল পাওয়া যাইবে। এনামেল বা পাথরের পাত্রে ছানার জল করিবে।

পরিশিষ্ট (ক)—খাদ্যদ্রব্যের উপাদান

চাউল	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	পরীক্ষক
দেশী	৯'৪	৬'৩৯	'১৫	৮৩'৩	'৭৬	মেডিকেল কলেজ
বালাম	১২'৫	৭'৫	'৪২	৭৮'৪৯	'৭৪	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
পাটনাই	১০'৮২	৬'৯২	১'২৮	৭৮'২৩	১'২	ডাঃ জে, এন্ মৈত্র
বাঁকতুলসী (আতপ)	১২'৪	৬'৮৩	'৭	৭৯'২	'৭৬	সায়েন্স এসোসিয়েসন
বাঁকতুলসী (সিদ্ধ)	১১'০৬	৬'৭	'৯	৮০'১	'৬৮	”
বোম্বাই	১০'৮৩	৯'১০	১'২৩	৭৭'১৩	'৮৬	ডাঃ জে, এন, মৈত্র
দাদখানি (পুরাতন)	১১'০	৫'৪	'৫	৮২'২	'৮২	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
চিনি শক্কর	১২'০	৬'৭	'১৬	৮০'৩৫	'৪০	”
ব্রহ্মদেশীয়	১০'৩২	৬'৮৩	'৮২	৭৯'৮০	'৮১	ডাঃ জে, এন মৈত্র
মুড়ি	১০'১	৫'৯	'৩	৮২'৪	১'৩	স্বাস্থ্যসমাচার পরীক্ষাগার
চিড়া (ভাজা)	৮'২	৯'২	'১	৭৪'২	৩'৩	ডাঃ চুণী লাল বসু
খই	...	৫'৭	...	৫০'০	...	মেডিকেল কলেজ

দাল	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	পরীক্ষক
দাল (গড়ে)	১১.৩	২৩৫	২.২৯	৫৫.৯	৭.১	পার্কস্
সোনামুগ	১১.৪	২৩.৮	২.০	৫৪.৮	৯.০	ওয়ার্ডেন, ডিমক্ ও হুপার
ভাজা মুগের দাল	৫.১	২৫.৫	২.৭	৫৪.১	১০.২	ঐ
কৃষ্ণ মুগ	১০.৮	২২.২	১.৪	৫৫.৫	৫.৮	ডাঃ চুণীলালবসু
মসুর	১১.৮	২৫.১	১.৩	৫৮.৪	৩.৪	ওয়ার্ডেন, ডিমক ও হুপার
অড়হর	১৩.৩	১৭.১	২.৬	৫৫.৭	১১.৩	ঐ
খেঁসারী	১২.৭৪	২৪.০৮	২.৩৮	৫১.৩৮	২.৮	পার্কস
মাষকলাই	১০.১	২২.৭	২.২	৫৫.৮	৯.২	ওয়ার্ডেন, ডিমক ও হুপার
ছোলা (আস্ত)	১১.৫	২১.৭	৪.২	৫৯.০	৩.৬	„
মটর (আস্ত)	১৫.০	২২.০	২.০	৫৩.০	২.৪	„
ছোলার দাল	৯.৫৮	২.৩৬৬	৪.৩০	৬০.০২	২.৪৪	সায়েন্স এসোসিয়েশন

দ্রব্য	জল	ছানা জাতীয় উপাদান	মাখন জাতীয় উপাদান	শর্করা জাতীয় উপাদান	লবণ জাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
গাভীদুগ্ধ (বিলাতীগরুর)	৮৬·৮	৪·০	৩৭	৪·৮	·৭	ব্লাইদ্
গাভী দুগ্ধ (দেশী গৃহ পালিত গরুর)	৮৬·৮৭	৩ ৯৭	৪·২৮	৪·৮২	·৬	সায়েন্স এসোসিয়েসন
গাভী দুগ্ধ (গড়ে)	৮৬·৪০	৩·৯৭	৪·৪০	৪·৫০	·৭৩	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
গাভী দুগ্ধ (কলিকাতার বাজারের)	৯২·১৭	২·৫৭	২·২৭	২·৬০	২·৩৯	সায়েন্স এসোসিয়েসন
গাভীদুগ্ধ (মাঠা তোলা)	৮৮·০	৪·০	১·৮০	৫·৪০	·৮	লেথ্বি
মহিষী দুগ্ধ	৮১·০	৪·৪	৯·০	৪·৮	·৮	ওয়াটসন
„ (গড়ে)	৮১·৮	৪·৫২	৮·২	৬·৬	·৮৮	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
ছাগী দুগ্ধ	৮৭·৫৪	৩·৬২	৪·২০	৪·০	·৫৬	ব্লাইদ্

খাদ্য	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	পরীক্ষক
ভাত	৫২'৭	৫'০	'১	৪১'৯	'৩	হচিন্‌সন্
গোধুম	১৪'৪	১৪'৬	১'২	৬০'৯	১'৬	গটিয়ার
ময়দা	১৫'০	১১'০	২'০	৭১'২	'৮	পার্কস
ঐ	১৭'৮	১১'০	১'৬	৬৭'৫	'৭	সায়েন্স এসোসিয়েসন
আটা	১৪'৬৫	১১'৫	২'৯	৬৭'১	৩'৮৫	মেডিকেল কলেজ
যাঁতায় ভাঙ্গা আটা	১১'৬০	১২'৮৬	৩'২১	৬৮'৫৪	২'৯৬	ডাঃ জে, এন্ মৈত্র
সুজি	১০'৫২	১৪'৩৮	২'৮	৪৭'৪২	'৫১	স্বাস্থ্য সমাচার পরীক্ষাগার
লুচি	১৯'৩	৭'৫	২২'৬৪	৫০'০৩	'৫৩	ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন
রুটি (ময়ান দেওয়া)	১৭'৩৩	৯'৪৩	৩'৭১	৬৯'২০	'৩৩	ঐ

দ্রব্য	জল	ছানা জাতীয় উপাদান	মাখন জাতীয় উপাদান	শর্করা জাতীয় উপাদান	লবণ জাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
গাধার দুধ	৯১'১৭	১'৭৯	১'০২	৫'৫	'৪২	ব্লাইদ
ভেড়ার দুগ্ধ	৮২'২৭	৭'১০	৫'৩০	৪'২০	১'০	"
ঘন দুগ্ধ	২৪'৯৪	৯'৬৮	৮'৯০	৫৪'৫৩	১'০৫	হেনার
দধি (উৎকৃষ্ট)	৮৭'৮৪	৬'৭৭	৩'৫৭	২'৮	'৬২	এন, এন, বসু
দধি (নাটোর)	৮৪'৯৩	৫'৬৩	৪'৮৫	২'৬৫	'৯৭	ডাঃ জে, এন্, মৈত্র
মাখন	৭'৫	১'০	৯০'৫	...	১'০	বেল্
ছানা	৫৮'৭২	২১'৬৮	১৬'৮	২৮	১'৬৮	ডাঃ জে, এন, মৈত্র
সন্দেশ (উৎকৃষ্ট)	২০'২৫	১৮'১৭	১৯'৭৫	৪০'১৮	১'৬৫	সায়েন্স এসোসিয়েশন
মাঠা	৬৬'০	২'৭	২৭'৭	২'৮	১'৮	লেথ্‌বি

খাদ্য	জল	ছানা জাতীয়	মাখম জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	পরীক্ষক
হংস ডিম্ব	৭০'৫	১৩'৩	১৪'৫	০	১'৩	হচিনসন্
কুক্কুট ডিম্ব	৭৩'৫	১৩'৫	১১'৬	০	১'০	পার্কস্
ইলিশ	৭৬'৩৩	১৪'৮৫	৯'২৩	০	'৯৫	ডাঃ জে, এন্ মৈত্র
রুই	৭৪'৬০	১৮'৩৫	৯.৫৬	০	১'৪২	ঐ
কই (ছাল, কাঁটা বাদে)	৮১'৮৩	১৭'৭৩	'৪২	০	১'০৬	ঐ
ভেটকি (ঐ)	৭৭'২৭	১৬'২৬	৪'১২	০	'৮৪	ঐ
পার্শে (ঐ)	...	১৫'২৭	৬'৩২	০	'৯৭	ঐ
তপ্সে	৭৭'২৭	১৬'৭৬	৪'১২	০	'৮৩	ঐ
মৃগেল (ঐ)	৮০'১	১৮'০৭	'৩৩	০	১' ৫	সায়েন্স এসোসিয়েসন
মাগুর (ঐ)	৭৮'৮৫	১৯'১৯	'৫	০	১'৩	ঐ
টেংরা	৭৭'৭	১৭'২৮	'৩	০	১'১৫	ঐ
গল্দা চিংড়ি (মুড়া বাদে)	৮৩'০৫	১৫'৪৫	'৪৮	০	'৯০	ঐ

মাংস	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	পরীক্ষক
ছাগ মাংস ...	...	২৪'০৬	২'৫	...	১'২	মেডিকেল কলেজ
হরিণ মাংস ...	৭৫'৭	১৯'৭	১'৯	...	১'১	হচিনসন
মেষ মাংস (অস্থিসহ স্থূলকায় মেষের)	৪৩'৭	১৩'৫	৩৩.২	...	'৮	গটিয়ার
মেষ মাংস (নাতি স্থূলকায়)	৫২'০	১৬'০	১৬'০	...	১'০	ঐ
কুক্কুট মাংস (fowl)	৭০'০	২৩'৩	৩'১	...	১'০	হচিনসন্
কাঁচা মাংসের থাক	...	১'৮	...	...	...	মেডিকেল কলেজ
রোষ্ট মাংস (Roast)	৫৪'৬	২৭'৬	১৫'৪৫	...	২'৯৫	রাঙ্ক

দ্রব্য	জল	ছানা জাতীয় উপাদান	মাখন জাতীয় উপাদান	শর্করা জাতীয় উপাদান	লবণ জাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
আলু	৭৪'০	২'০	'১৬	২১'০	১'০	পার্কস
,, অন্যবিধ	৮০'২	১'৩১	২'৩৫	১৫'২৩	'০৯	এ, কে, টর্ণার
আলুর খোসা	৮০'১	২'৭	'৮	১৪'৬	১'৮	স্বাস্থ্যসমাচার গবেষণাগার
বাঁধাকপি	৯১'০	১'৮	'০৫	৫'৮	'৭	পার্কস
,,	৯২'০	১'৫৬	১'১১	৪'৯	'৪২	এ, কে, টর্ণার
,,	৯১'৫	১'৫	...	২'১	'৬	ডাঃ চুণীলাল বসু
ইঁচোড়	৬৩'৪১	৮'৫২	'৯৪	১৬'২৮	১'৯৫	ডাঃ জে, এন, মৈত্র
ফুলকপি	৯২'০	'৫	...	২'০	'৭	পটিয়ার
কলাই শুঁটি	৭৮'৪৪	৬'৩৫	'৫৩	১২'০	'৮১	হচিনসন
অন্যান্য তরকারী (গড়ে)	...	২'০৫	'৩৪	৫'৩৩	...	মেডিকেল কলেজ
পিঁয়াজ	৮৮'৯০	১'৫৭	২'৯৯	২'৫	৪৫	এ, কে, টর্ণার

দ্রব্য	জল	ছানা জাতীয় উপাদান	মাখন জাতীয় উপাদান	শর্করা জাতীয় উপাদান	লবণ জাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
লাউ	৯৫'৮৮	'৫৫	২'৩৬	'৯	'২৬	এ, কে, টর্ণার
বেগুণ	৯৩'৬৪	'৮৯	১'৪৮	৩'৪৮	১'৩৮	"
পটোল	৯০'৬৪	৫'২৪	'৩৬	৩'৮৬	'৮৪	ডাঃ জে, এন্, মৈত্র
কাঁচা কলা	৭০'০	১'৩১	২'৭	১৬'৮	'১৭	ডাঃ এন্, এন্, বসু
গাজর	৮৮'১২	'৮৭	৩'০৪	৭'২৮	'৬৮	এ, কে, টর্ণার
রাঙ্গা আলু	৭৪'১০	'৭৮	৩'৩১	২১'১৭	'৫২	"
ওল	৮০.৬০	২'২৯	২'৮৯	১২'৮	১'৪	"
বিলাতী বেগুন	৯৪'৭৩	'৮০	'৪৯	৩'৬	...	"

খাদ্য	জল	ছানা জাতী	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	পরীক্ষক
কাঁচা আম	৯০'৬৯	১'৫৯	...	৩'৩৮	'২৭	এন, এন, বসু
পাকা আম	৭৫'৫	১'২	'৭৬	১৭'৫৮	১'২	ঐ
কাঁঠাল	৮০'৮২	১'১৬	'৪৩	১৮'৫৮	'৯৬	জে, এন্ মৈত্র
কাঁঠালি কলা	৬৭'৬৮	১'০৫	'০৫	১৬'১১	'৭৭	ডাঃ চুণীলাল বসু
চাটিম কলা	৭৩'৩২	১'৫০	...	১৭.৭৮	'৭৩	ঐ
চাঁপা কলা	৭১'৪৭	১'৮০	'১৩	১৪'১৫	'৯৭	ঐ
আনারস	৯০'২৬	'৪৬	'২০	৮'১৩	১'৬৮	জে, এন, মৈত্র
ঝুনা নারিকেল	১৯'০৩	৫'৯৪	৫৩'১৪	৫'৪৬	১'৩৯	ঐ
চীনা বাদাম	২৬':৩	২৬'১৩	৪৩'৮১	১৩'৬৮	১'৫৮	ঐ
ঐ (ভাজা)	৪'২	২৪'১	৪৭'২	৮'০	...	ডাঃ চুণীলাল বসু
আঙ্গুর	৭৪'৫২	'৫৯	...	২৪'৩৬	'৫৩	কনিগ
বেদানারস	...	'৯৩	...	৭'৬	...	মেডিকেল কলেজ

পরিশিষ্ট (খ)—খাদ্যপ্রাণ তালিকা*

খাদ্য	ক	খ	গ	ঘ
ঢেঁকী ছাঁটা চাল	+	+		
কলছাঁটা চাল	0	0	0	
আতপ চিঁড়ে	+	++	?	
মসুর (আস্ত)	+	++		
মটর (ঐ)	+	++		
দাল (অন্যান্য)	+	++		
গম	++	++	—	+
গমের ভুসি	++	++		
ময়দার রুটি (জলে ছানা)	—	+	—	—
ঐ (দুধে ছানা	+	+	—	+
মোটা আটার রুটি(জলে ছানা)	+	++	—	+
ঐ (দুধে ছানা)	++	++	?	+
সাদা পাউরুটি	0	0	0	
লাল পাউরুটি	0	+	0	
আস্ত বার্লি দানা	+	+	—	
ভুট্টা	+	++	—	
ওট (জই)	+	++	—	—
রাই	+	++	?	
কাঁচাদুধ	+++	++	++V	++
একবল্কা দুধ	+++	++	+	++

* সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের তালিকা দৃষ্টে

খাদ্য	ক	খ	গ	ঘ
মাখন-তোলা দুধ	+	+	+V	
ঘোল	+	++	+V	
ননী	+++	++	+V	
মাখন	+++	—	—	
ছানা	++	++	—	
ঘৃত	++	—	—	
সরিষার তৈল	+	++	?	
মাছের তৈল	+	+	?	—
মাছের ডিম	+	++	?	—
কডলিভার তৈল	+++	—	—	
পক্ষীর ডিম	+++	+		
মেটে (যকৃৎ)	++	++	?	+
পশুর মগজ	+	++	?	+
ঐ কলিজা	+	+	+	+
খাসীর চর্ব্বি	++			
সাদা চিনি	0	0	0	0
গুড়			++	
মধু		+		
বাদাম	+	++?	X	
চিনাবাদাম	+	++?		
আখরোট	X	++	X	
নারিকেল	+	++	—	+
ডাবের শাঁস	?	+	+	+
আম		+	+	

খাদ্য	ক	খ	গ	ঘ
জাম		+	+	
পাকা কাঁঠাল	+	?	+	+
আনারস	++	++	+++	
শসা		+		
কলা	?	+	+	
পেঁপে	+	++		
বেল	+	?	++	
বাতাবি		++	++	
লেবুর রস	—	++	+++	
কমলা লেবুর রস	+	++	+++	
আঙ্গুর ফল	?	++	++	
আঙ্গুরের রস (বিলাতী)	?	+	+	
আপেল	+	++	++	
টেপারী	X	X	+++	
পিচফল	++	+	++	
তালশাঁস	?	?	+	
আমসত্ব	+	+	+	
ফলের সিরাপ	0	0	0	
আলু (অল্প সিদ্ধ)	+	++	++	
আলুর খোসা	0	0	0	
রাঙ্গা আলু	++	+		
কাঁচাকলা	+	?	++	
ঢ্যাঁড়স	+	+++	+	
এঁচোড়	+	?	?	
লাউ	++	?	?	

খাদ্য	ক	খ	গ	ঘ
বাঁধাকপি (কাঁচা)	++	+	+++	
ঐ অর্দ্ধসিদ্ধ	++	+	+	
কপির আচার	X	X	+++	
ফুলকপি	+	++	?	
গাজর (কাঁচা)	++	+	+	
ঐ অল্পসিদ্ধ	++	+	+V	
শালগম	—	++	+++	
মূলার শাক	++			
মূলার শাঁস	0	0	0	
মূলার খোসা			+++	
শিম (টাট্‌কা)	++	++	X	
শিম (শুকনা)		++		
মটর শুঁটি (টাটকা)	++	++	+++	+
অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ	+	++	++	
বরবটি	+	+	—	
বিলাতী বেগুন	++	+++	+++	
পেঁয়াজ	?	++	++	
লেটুয়া শাক	++	++	+++	+
পালং শাক (টাটকা)	+++	+++	+++	
ধনের শাক	+	+	+	+
শুল্‌ফা শাক	+	+	+	+
পুদিনা	+	+	+	+
বিট	—	+	+	+
সয়াবিন	+	++		

সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ—

+ খাদ্য প্রাণ আছে। ? খাদ্য প্রাণ থাকা সম্বন্ধে অনিশ্চিত।
++ ঐ বেশী আছে। X অজ্ঞাত। V পরিবর্ত্তনশীল।
+++ ঐ খুব বেশী আছে।
—ঐ নামমাত্র আছে।